ডঃ আশিস দেবরায়

গল্প যখন বিজ্ঞান



গল্প যখন বিজ্ঞান

ডঃ আশিস দেবরায়

পরিবেশক / কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

GALPA JAKHAN BIJNAN

By Dr. Ashis Debroy

প্রচ্ছদ / পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম প্রকাশ / আষাঢ় ১৩৮৯, জুন ১৯৮৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ / আষাঢ় ১৩৯৬, জুন ১৯৮৯

পত্রপুট

প্রকাশিকা / আরতি চক্রবর্তী, পত্রপুট, ৩৭/৯ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক / বিজয় চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন, ৩৭/৯ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পনের টাকা

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

বন্ধুবরেষু

'বিজ্ঞান' অর্থে বিশেষ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। বস্তু-নির্ভর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মধ্য দিয়ে কোনো বিষয়ে পাওয়া যে-বিশেষ ধরনের জ্ঞান, অর্থাৎ যে-জ্ঞান ব্যক্তিগতের সীমানা ছাড়িয়ে সর্বজনীন, প্রমাণ-সিদ্ধ হয়ে তর্কাতীত, ইংরেজিতে তাই হলো সায়েন্স। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিজ্ঞানের বিষয় হল তাই, যা ব্যক্তিগত নয়; নৈব্যক্তিক মানব-ভুবনের সত্যই তার সত্য। সত্য আর বিশ্বসত্তা একই—সেটি হল মানবিক। না হলে ব্যক্তিগত হিসেবে সত্য বলে যা-কিছু জানছি তার সত্যতা কোথায়—অন্তত বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হতে গেলে তো যুক্তিবিচার অপরিহার্য, অর্থাৎ মানবিক মনের মধ্যস্থতা অস্বীকার করা যায় না···বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল এই যে, ব্যক্তিমনের সীমা ও সংকীর্ণতা, ত্রুটি ও ভ্রান্তি, বাদ দিতে দিতে, বিশ্বমানবের মনে সত্যের যে ধারণা সম্ভব সেই দিকে এগিয়ে যাওয়া।'

এই এগিয়ে যাওয়ার পথে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত বিশেষ জ্ঞানই হলো সেই সত্য, যা আমাদের কাছে আবিষ্কার। এবং মানবকল্যাণে যা কিনা আশীর্বাদ হয়ে আমাদের জীবনে নেমে আসে। তবে একটা কথা, এই সত্য শুধু আবিষ্কৃত হলেই চলে না। বিশ্বমানবতার প্রয়োজনে যখন সে এগিয়ে এসেছে,তখন তাকে সহজ ও সুন্দর ধ্যানধারণায় বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেবারও দায়িত্ব থেকে যায়। আমাদের দেশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও এই যুক্তি স্বীকার করে নিজেরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের রচনার মাধ্যমে। অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রাপ্ত এই সত্যকে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেবার জন্যে—যাতে তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি আরও সুদূর প্রসারিত হয়।

সেই ভাবনা থেকেই আমার এই রচনা। রচনাগুলোর প্রায় বারো আনাই রসায়নবিদ্যাকে কেন্দ্র করে, আর শেষের বাকী চার আনা তৈরি হয়েছে পদার্থবিদ্যায় ভর দিয়ে। আমাদের জীবনে নিত্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জিনিসপত্রের ভেতরে, মানুষের অকৃপণ কল্যাণে, রসায়নবিদ্যা যে-ভাবে জড়িয়ে আছে—সেই বিষয়গুলো নিয়ে যেমন আলোচনা করেছি, তেমনি আলোচনা করেছি এই রসায়ন থেকেই পাওয়া সিগারেট, মদ, নারকটিক ড্রাগ-এর কুফল নিয়ে, যাতে কিশোরেরা এদের আকর্ষণ থেকে দূরে থাকে। তাছাড়া মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে পদার্থবিদ্যার যে-বিপুল অবদান, তার থেকেও এমন কয়েকটি বিষয় এখানে তুলে ধরেছি—যা কিনা মানুষের জীবনযাপনের মান নানাভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে আর চলায় জুগিয়েছে গতিবেগ, কমিয়ে এনেছে বিশাল পৃথিবীর ছড়ানো দূরত্ব।

এই সব কথা জানতে শুধু ছোট ছেলেমেয়ে কেন, আমাদের মতো বড়দের কৌতূহলও কম নয়। আমার এ-আলোচনা বিষয়-কেন্দ্রিক। এবং মূলত কিশোরদের জন্যে। সেই কারণে রচনার গাম্ভীর্য যাতে না-বেড়ে যায়, লেখার সময় তা আমার মাথায় ছিলো। নানা ঘটনার মজা টেনে, অনেক ক্ষেত্রে দুটো তিনটে চরিত্র এনে গল্পের ছলেও ব্যাপারটাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি—যাতে বিষয়টি সহজবোধ্য হয়ে তাদের জানার জগৎকে আরো বৃহত্তর পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে পারে।

তবে যাদের জন্যে লেখা, তাদের ভালো লাগলেই সমস্ত চেষ্টা, আগ্রহ ও আন্তরিকতার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

বইয়ের বেশ কিছু লেখাই 'আনন্দমেলা' ও 'শুকতারা' পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত। খসড়ার কপি করতে কল্যাণীয়া রত্না শীল প্রচুর সাহায্য করেছে। আর, 'পত্রপুট'-এর উৎসাহ না-পেলে এসব লেখা হয়তো এত তাড়াতাড়ি গোছানো হতো না।

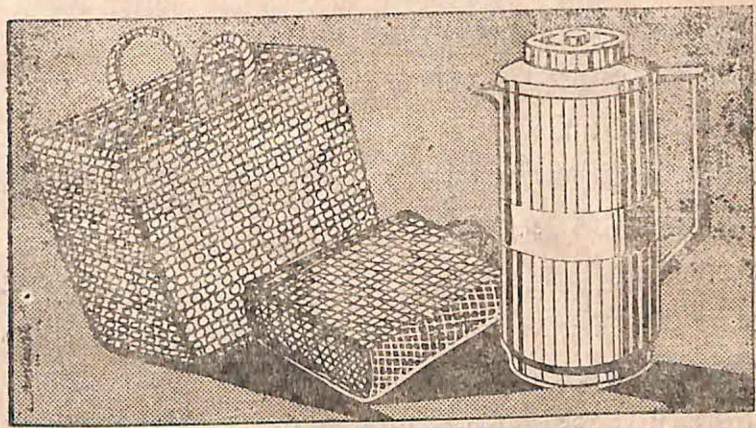
আশিস দেবরায়

সূচীপত্র

প্লাস্টিক-যুগ ৯
নতুন রঙের খেলা ১৪
কাগজের ইতিকথা ২০
রাবারের কথা ২৫
রঙবাহার ৩১
ভিটামিন-প্রসঙ্গ ৩৭
কোনো খাদ্যই ফেলনা নয় ৪৩
মদ না, অ্যালকোহল ৪৯
মাদকতার ওষুধ, কিন্তু ওষুধ নয় ৫৫
সিগারেট খাওয়া কি খারাপ ৬১
রোগ নিরাময়ে রসায়নের অবদান ৬৭
শক্তি-উৎপাদনের উৎস ৭৪
উড়োজাহাজ ৮১
টেলিভিশন ৯০
পাতাল-রেল ৯৬

প্লাস্টিক-যুগ

ববি কাকুর সঙ্গে বাজার থেকে অনেক জিনিস কিনে নিয়ে এল। তার মধ্যে আছে প্লাস্টিকের বালতি, মগ, সাবানের কেস, জল রাখার জাগ, নুন রাখার কৌটো, খাবারের থালা—আরও কত কী! কাকু নতুন বাড়ি ভাড়া করে শীগগিরই চলে যাবেন—তাই এত সব জিনিস কেনা। বাড়িতে এসে জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে ববি কাকুকে বলল, 'কাকু দেখ, তুমি এতগুলি জিনিস কিনলে, এর প্রায় সবই কিন্তু



প্লাস্টিকের। প্লাস্টিকের জিনিস দেখছি আমাদের বেশ কাজে লাগে—তাই না?'

কাকু উত্তর দিলেন, আমরা তো প্লাস্টিকের মাত্র কয়েকটা জিনিস কিনেছি। প্লাস্টিক দিয়ে আরও বহু রকমের জিনিস এখন তৈরি হচ্ছে। যেমন টুথব্রাস, রেডিওর বাক্স, বলপেন, শিশি-বোতল ও তাদের ছিপি, সুতো, চেয়ার-টেবিল বানানোর বেত বা দড়ির সঙ্গে নানা প্রকারের বাক্স, জিনিসপত্র নেওয়ার ব্যাগ, পর্দার কাপড়, টেবিলের ঢাকনা, চিরুনি, ইলেকট্রিকের সামগ্রী—সবই তো প্লাস্টিকের। এমন কি ফ্লাস্ক, ইনজেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ পর্যন্ত প্লাস্টিকে তৈরি করা হচ্ছে।

এছাড়া প্লাস্টিকে তৈরি কাগজে কত কী জিনিস যে প্যাকিং বা মোড়া হয় তার হিসেব নেই—যেমন কাপড়, জামাপ্যান্ট, খাবার জিনিস, গুঁড়ো সাবান, মশলা জাতীয় দ্রব্যাদি, দুধ, জুতো, মোজা ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত বহুবার প্লাস্টিকের নানারকম জিনিস ব্যবহার করছি। আধুনিক সমাজে প্লাস্টিকের অবদান প্রচুর। চাষ-আবাদেও প্লাস্টিক আজকাল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।'

ববি জিজ্ঞেস করল, 'কাকু, প্লাস্টিক কি রবারের মতো গাছের আঠা থেকে তৈরি হয়?'

ববির আগ্রহ দেখে খুশি হয়ে কাকু বোঝাতে আরম্ভ করলেন, 'না, রবারের মতো প্লাস্টিক গাছের আঠা থেকে আসে না। প্লাস্টিক রাসায়নিক পদ্ধতিতে কারখানায় তৈরি করা হয়। প্রায় ১২০ বছর আগে প্রথম প্লাস্টিক তৈরি হয়েছিল কাপড়ের তুলো থেকে পাওয়া সেলুলস নাইট্রেটের সঙ্গে কর্পূরের সংমিশ্রণে—এই প্লাস্টিকের আর এক নাম সেলুলয়েড। তবে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা প্রথমে পলিইথিলিন নামে প্লাস্টিক তৈরি করলেন ১৯৩৩ সালে। আজকের বাজারে পাওয়া বেশির ভাগ প্লাস্টিকের জিনিসই কিন্তু এই পলিইথিলিন থেকে তৈরি। পলিইথিলিন থেকে প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরির উজ্জ্বল সম্ভাবনার আভাস পেয়ে, ১৯৩৮ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রথম প্লাস্টিক তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় এই কারখানায় রাডারের তার বা কেবল্ তৈরি করা হত। এরপর আমেরিকায় ১৯৪৩ সালে প্লাস্টিকের প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। ক্রমশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিকের বহু কারখানা ছড়িয়ে পড়েছে। ভেবে ছাখো, ১৯৩৩ সালে যে-প্লাস্টিক ইংল্যাণ্ডে মাত্র কয়েক গ্রাম তৈরি হয়েছিল, সেই প্লাস্টিকই ১৯৮০ সালে পৃথিবীর সব দেশ মিলিয়ে আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন তৈরি হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় প্লাস্টিক কত বেশি পরিমাণে আজকাল ব্যবহৃত হয়।'

ববি বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'বিজ্ঞানীরা পলিইথিলিন কী

ভাবে তৈরি করলেন ?'

কাকু বললেন, 'ইথিলিন নামে একটা গ্যাস ল্যাবরেটরিতে বানানো যায়। এই গ্যাসের অণুগুলি যথেষ্ট চাপ ও তাপের ফলে নিজেদের মধ্যে সংযোজন হয়ে (ইংরেজিতে যাকে পলিমেরাইজেশন বলা হয়) মোম জাতীয় এক পদার্থে পরিণত হয় এবং এই মোম জাতীয় পদার্থই পলিইথিলিন জাতীয় প্লাস্টিক। আজকাল ইথিলিন বেশির ভাগই পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত ন্যাপথা থেকে তৈরি করা হয়—এই প্রথায় ইথিলিন সহজে ও কম খরচে পাওয়া যায়।'

'কাকু, সব প্লাস্টিকই কি ইথিলিন থেকে তৈরি হয়?'

'সব প্লাস্টিক ইথিলিন থেকে তৈরি হয় না—তবে এ-কথা বলতে হবে যে, ইথিলিন থেকে তৈরি প্লাস্টিকই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইথিলিন জাতীয় অনেক রাসায়নিক বস্তুকে পলিমরাইজ করে নানান ধরনের প্লাস্টিক পাওয়া যায়। যেমন প্রপিলিন নামে রাসায়নিক পদার্থকে প্রায় একইভাবে পলিপ্রপিলিন নামে এক ভিন্ন প্লাস্টিকে পরিণত করা যায়। এই পলিপ্রপিলিন প্লাস্টিক দিয়ে অনেক বেশি শক্ত ও মজবুত জিনিসপত্র তৈরি হয়।'

'এই পলিপ্রপিলিনও কি প্রথমে ইংল্যাণ্ডে তৈরি হয় ?'

কাকু বললেন, 'খুব ভাল প্রশ্ন করেছ। ইংল্যাণ্ডে পলিইথিলিন তৈরির পরই পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে ভিন্ন রকমের প্লাস্টিক তৈরির আগ্রহ দেখা দিল। তবে প্রথম পলিপ্রপিলিন তৈরি করল ইংল্যাণ্ড নয়, ১৯৫৪ সালে ইতালির বিজ্ঞানীরা। ১৯৪৭ সালে ইতালির এক বড় সংস্থা ব্যাপকভাবে পলিপ্রপিলিন তৈরির জন্যে কারখানা বসিয়ে ফেলল। এর কিছু পরেই ১৯৫৮ সালে আমেরিকায় ও ১৯৬০ সালে ইংল্যাণ্ডে পলিপ্রপিলিন তৈরির কারখানা এসে গেল। ১৯৫৮ সালে মাত্র ২০০০ টন পলিপ্রপিলিন তৈরি হয়েছিল আর ১৯৮১ সালে সারা পৃথিবীতে ৬০ লক্ষ টন পলিপ্রপিলিন তৈরি হওয়ার কথা।'

রবির জানবার উৎসাহ বাড়ছিল, তাই জিজ্ঞেস করল, 'কাকু, আমাদের দেশে কবে প্লাস্টিক তৈরি শুরু হয় ?'

কাকু বললেন, 'আমাদের দেশে পলিইথিলিন তৈরির কারখানা প্রথম স্থাপিত হয় ১৯৫৯ সালে। তবে পলিপ্রপিলিন তৈরির প্রথম কারখানা এল অনেক পরে—এই সেদিন ১৯৭৮ সালে গুজরাটে। এখন আমাদের ইথিলিন ও প্রপিলিন দুই-ই ন্যাপথা থেকে সংগ্রহ করা যায়, তাই পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই দুই রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করার খরচও প্রচুর বাড়ছে। তবে পৃথিবীর বহু দেশে এই দুটি বস্তুকে অন্য উপায়ে সস্তায় তৈরি করার চেষ্টা চলছে।'

ববি বলল, 'তার মানে, যে-দেশে যত বেশি পরিমাণে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে, সেখানে প্লাস্টিক তৈরিরও তত বেশি সুযোগ হবে।'

কাকু মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ। আমাদের দেশে বোম্বে হাইতে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেলে শুধু যে পেট্রোলের সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে তা নয়, এর ফলে প্লাস্টিক শিল্পও বেড়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচুর পেট্রোলিয়াম আমদানি করতে হচ্ছে—তাই প্লাস্টিক-শিল্পের কাঁচামাল যোগাড়ের ব্যাপারে আমাদের এখনও বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ প্লাস্টিক-শিল্প যে শুধু বহুরকম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সস্তা দামে তৈরি করতে সাহায্য করছে তা নয়, এর ফলে এমন বহু রকমের কাঁচামাল (যেমন নানারকম ধাতু, কাঠ, কাচ ইত্যাদি) সঞ্চয় করা যাচ্ছে, যে-গুলিকে অন্য কাজে লাগানো যায়। প্লাস্টিক-শিল্পের প্রসারের সঙ্গে অনেক লোকের কর্ম-সংস্থানও হচ্ছে।'

ববিকে এবার একটু চিন্তিত মনে হল। বলল, 'তুমি প্রথমেই বলছিলে যে, প্লাস্টিক চাষবাসে যথেষ্ট সাহায্য করছে, কিন্তু কী ভাবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

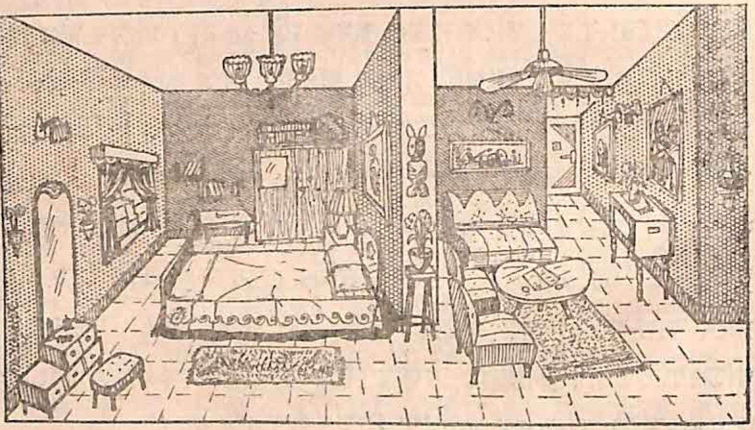
কাকু হেসে বললেন, 'এটা বোঝাতে একটু সময় লাগবে। ক্ষেতের কাজে জল জমিয়ে রাখার জন্যে যে-সব ছোট্ট পুকুর বা ডোবা তৈরি করা হয়, তার নীচে ও পাশে প্লাস্টিক চাদরের মতো পেতে দিলে, তার থেকে জল কোনও দিকে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই ব্যবস্থার

তুলনায় পাথর বা সিমেন্ট-বাঁধানো পুকুরে অনেক বেশি খরচ পড়ে। স্পেনে কমলালেবু জাতীয় গাছে সেচের জন্যে এমনি ভাবে ৩০ লক্ষ গ্যালন জল জমিয়ে রাখা হয়। দশ বছর ধরে এই পদ্ধতি ওখানে চলছে। এ ছাড়া সেচের জন্যে নালাতে জমানো জলও ভালভাবে রাখা যায়, যদি তার দু-ধারে প্লাস্টিকের চাদর বিছিয়ে দেওয়া যায়। আজকাল এক উন্নত প্রথায় মাটিতে জল দেওয়া যায়, যার ফলে জলের কোনও অপচয় হয় না। সমস্ত মাটিতে জল না দিয়ে শুধুমাত্র গাছের গোড়ায় বা মূলে প্লাস্টিকের সিরিঞ্জের সাহায্যে জল দিলে গাছ প্রয়োজন মতো জল পায়। আর, জলের সঙ্গে গাছের সারও পরিমাণ মতো দেওয়া যায়। তাতে সারও অযথা নষ্ট হয় না। সারের দাম দিন-দিন খুব বাড়ছে, কাজেই সারের অপচয় রোধ করা খুবই জরুরি। প্লাস্টিক বিছিয়ে যদি মাটি ঢেকে রাখা হয়, তবে তাপে শুকিয়ে যেতে পারে না। এই ঢাকনা যদি কালো হয়, সূর্যের আলোও তাহলে মাটির খুব ভেতরে যেতে পারে না, ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো আগাছা জন্মানোর ভয় থাকে না। খোলা জমির চেয়ে ঢাকা জমি রাত্রে গরম থাকে বলে গাছের মূল তাড়াতাড়ি বড় হয়, গাছও তাড়াতাড়ি বাড়ে। খাদ্যশস্য ইত্যাদি প্লাস্টিকের বস্তায় বেঁধে রাখলে ভাল থাকে এবং এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পাঠাতে সুবিধে হয়।'

ববিকে এবার বেশ গম্ভীর দেখাল। ও ভাবল, কিছুদিন পরে হয়তো প্লাস্টিক দিয়ে গাড়ি, বাড়ি, সাইকেল, ড্রয়িংরুমের ফার্নিচার ইত্যাদিও তৈরি হবে। এ-ভাবে ভাবতে বেশ ভাল লাগল ববির।

নতুন রঙের খেলা

অর্ণবের বাড়ির ভেতরে ও বাইরের দেয়ালে রঙ লাগানো হচ্ছে। দেখেশুনে অর্ণব খুব খুশি। প্রায় নাচতে থাকে আর কী। ইস, কতদিন পরে বাড়িটা এবার ঝকমকে দেখাবে। ভাবতেই ওর বন্ধু জয়দীপদের বাড়িটার কথা মনে হয় অর্ণবের। জয়দীপদের বাড়িটা সব সময় কেমন উজ্জ্বল লাগে। কী বর্ষা, কী শীত—কখনোই মনে হয় না পুরনো। অথচ ওদের বাড়িটা কেমন যেন কালচে দাগ ধরে



গেছে। আর মাঝে-মাঝে বর্ষার দিনে তো সবুজ শ্যাওলাও ধরে যায় দেয়ালটায়। যাক, এবার রঙ হবে। জয়দীপের মতো ওদের বাড়িটাও ঝলমলে হয়ে উঠবে।

কিন্তু একই ঘরে দু'রকম রঙ কেন? কই, জয়দীপদের বাড়িতে তো এমন নেই! ওদের ঘরের ভেতরকার সব দেয়ালেই তো এক রকমের রঙ। অথচ ওদের বাড়িতে একটা ঘরেই দুটো দেয়ালের রঙ দু'রকমের হচ্ছে। আর সে-সবের তদারকি করছেন আর কেউ নয়—স্বয়ং ছোটমামা। ছোটমামা তো না-জেনে কিছু করতে পারেন না। একে বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, তার ওপর রয়েছে কত বড়-বড় বাড়ি তৈরির অভিজ্ঞতা।

খানিকটা সাহস নিয়ে অর্ণব ছোটমামাকে জিজ্ঞেস করে এক সময়, 'আচ্ছা মামা, একই ঘরে দু'রকমের রঙ লাগালে কি বেশি সুন্দর দেখাবে?'

মামা উত্তর দেন, 'আগেকার দিনে ঘরের চারপাশে দেয়ালে একই রকমের রঙ লাগান হত, কিন্তু নানা রঙে এখন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে।'

'পরীক্ষা-নিরীক্ষা কী মামা?'

'এই সবাই মিলে ভাবচে, চিন্তা করছে, হাতে-কলমে দেখছে যে, বাড়ির বাইরে কী রঙ লাগান যাবে আর ভেতরেই-বা কতটা কী লাগান হবে। কোন্ রঙটা কোথায় লাগান ঠিক, এই ভাবনা-চিন্তার নামই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এমন কী, আজকাল এই নিয়ে বই পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে।'

'বই পর্যন্ত বেরিয়েছে!' অর্ণব অবাক হয়।

মামা বললেন, 'হ্যাঁ, তবে আর বলছি কী! তাহলে প্রথম থেকেই বলি শোন।'

অর্ণব বলে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনবো। আমার খুব ভাললাগছে মামা—তুমি বলো।'

মামা বলেন, 'দাঁড়া, তোকে বুঝিয়ে বলি। বাড়িতে রঙ লাগানর আগে ঠিক পছন্দ মতো রঙ বেছে নিতে হবে, যাতে ওই রঙ বাড়ির ভেতরে বা বাইরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। একই ঘরে দু'রকমের রঙ লাগিয়ে ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। সাধারণত পাতলা রঙের মিশ্রণ ঘরের স্নিগ্ধতা বাড়ায়; কখনো যদি বড় ঘরে অন্য রঙের সঙ্গে দেয়ালের কিছু অংশে গাঢ় রঙ লাগালে হয় বা সম্ভব হলে কখনো আবার দু-তিন রকমের রঙ দিয়ে ঘরের বিভিন্ন অংশ রঙ করলে দেখতে বেশ সুন্দর দেখায়। ধরো, পাশে কম কিন্তু লম্বায় বড় ঘরের পাশের দেয়ালে গাঢ় রঙ লাগালে অনেক সময় সেই ঘরকে পাশে বড় দেখায়। আবার ছোট্ট ঘরের দেয়ালে পাতলা রঙ আর ওপরে সিলিং-এ সাদা রঙ দিলে ঘরটিকে বড় ও উঁচু দেখায়। এছাড়া

রঙ করার পর ঘর যাতে উজ্জ্বল দেখায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। ঘরের কোনো দেয়ালে সুন্দর কোনো শিল্পকলা বা কাচ জাতীয় কিছু যদি সাজানো থাকে, তবে সে-দেয়ালে গাঢ় রঙ করে বাকি অংশে পাতলা রঙ দিলে ঘরটিকে বিশেষভাবে সুন্দর দেখায়। অবশ্য মনে রাখতে হবে, যে-কোনো ঘরে নানান রকমের রঙ বা তীব্র রঙ লাগানো ঠিক হবে না। তেমনি ঘরে টাঙানো পর্দা ইত্যাদি ঘরের রঙের মতো হুবহু একই রঙের হওয়া উচিত নয়।'

অর্ণব কী আবার বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে মামা বললেন, 'এত কথাই যখন বললাম, তখন ছোট্ট করে বিভিন্ন রকমের রঙ সম্বন্ধে তোকে কিছু বলা দরকার। লাল, হলুদ ও নীল রঙকে প্রাথমিক রঙ বলা হয়। কিন্তু সবুজ, কমলা ও বেগুনী রঙগুলোকে মাধ্যমিক রঙ বলা হয়, যেহেতু প্রাথমিক রঙের মিশ্রণে এই রঙগুলো পাওয়া যায়। আবার কিছু একসঙ্গে মেশানো রঙ আছে, যেমন লাল-কমলালেবু রঙের মিশ্রণ বা হলুদ-সবুজ রঙের মিশ্রণ, যা কিনা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রঙের মিশ্রণে পাওয়া যায়। নানা রঙের বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণেও আরো অনেক নতুন রঙের সৃষ্টি হয়। এছাড়া সাদা, কালো, পাতলা কালো (গ্রে) এবং দুধের সরের মতো (ক্রিম) রঙও যে-কোনো জিনিস রঙ করার পরিকল্পনায় প্রয়োজন হয়, ঝলমলে রঙ পরিমাণ মতো মনোরম করার জন্যে।'

অর্ণব এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা মামা, কলকাতা শহরে বা এদেশের অন্য কোথাও লোকে বাড়ি খুব কমই রঙ করে, তাই না? তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো বেশির ভাগ বাড়িই খুব আগে রঙ হয়েছিল, তারপর আর বহুদিন ধরে রঙ পড়েনি। সব লোকে যদি বাড়ি এই ভাবে রঙ না-করে ফেলে রাখে, তাহলে শহরটা দেখতে দিনকে দিন কী ভয়ঙ্কর নোংরা হয়ে যাবে নাকি।'

মামা বললেন, 'তুই ঠিকই বলেছিস অর্ণব। তোকে এ-প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প বলছি। কয়েক বছর আগে রঙ-শিল্পের নানা প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা ব্যক্তি এক সভার আয়োজন করেন—তাতে

প্রধান অতিথি হিসাবে ওঁরা আমন্ত্রণ জানালেন ভারতের শিল্প ও রাসায়নিক মন্ত্রীকে। ওঁরা ভেবেছিলেন যে, রঙ-শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা মন্ত্রীমহোদয়ের সামনে তুলে ধরবেন ও তাঁকে সেগুলো সুরাহা করবার জন্যে অনুরোধ করবেন। হঠাৎ অনিবার্য কারণে সেই মন্ত্রী সভায় আসতে না-পারায়, তাড়াতাড়ির মধ্যে কর্মকর্তারা ভারতের আইনমন্ত্রীকে সেই সভায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। রঙ-শিল্পের ওপর যিনি প্রধান বক্তা ছিলেন, তিনি চিন্তা করে দেখলেন, রঙ-শিল্পের সমস্যাগুলো আইনমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরে কোনো লাভ হবে না। তাই তিনি সে-সব কিছুই না-বলে, মন্ত্রীমহোদয়কে মজা করে অনুরোধ করলেন যে, দেশে কি এমন এক আইন চালু করা যায় না, যাতে ভারতীয় নাগরিকদের নিজেদের বাড়ি বছরে অন্তত একবার রঙ করতেই হয়।

'এবার আসল কথায় আসি। সত্যিই আমাদের দেশে বাড়ির মালিকরা বাড়ি রঙ করায় মোটেই আগ্রহ দেখায় না। আমাদের দেশে প্রতি ৪০০ জন লোকের মধ্যে ১ জন লোক রঙ ব্যবহার করে। পৃথিবীর বহু উন্নতিশীল দেশেই ৪০০ জনের মধ্যে প্রায় ১০০ জন রঙ ব্যবহার করে। এদেশে লোকের আর্থিক সঙ্গতি এত কম যে, এখনও বেশির ভাগ বাড়িতে চুন দিয়ে রঙের কাজ চালান হয়। অবশ্য বড় শহরে বহু লোকই বাড়ি রঙ করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু ব্যাপারটা গায়ে লাগায় না। আর এ-কথাও বলা দরকার গত কয়েক বছরে রঙের দাম অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। তার ফলে ঠিক সময় বাড়ি রঙ করা বহু লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।'

অর্ণবের রঙ সম্বন্ধে আরও জানতে আগ্রহ হচ্ছিল। তাই আবার জিজ্ঞেস করল, 'মামা, রঙ কী ভাবে তৈরি হয়?'

মামা অর্ণবের জানার আগ্রহ দেখে খুব খুশি। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বোঝাতে লাগলেন, 'বাড়িতে চুনকাম করতে দেখেছিস তো—চুনজল লাগাবার কিছুক্ষণ পরে চুনজলের জলটা উড়ে যায় এবং দেয়ালের বুকে লেগে-থাকা চুন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক ওই ভাবে রঙ তৈরি হয়; কোনো কঠিন পদার্থকে তরল পদার্থের

মধ্যে মেশালে কঠিন পদার্থ সেখানে ভাসমান অবস্থায় থাকে। বাড়িতে রঙ লাগানর পর রঙের তরল পদার্থটি উড়ে যায় আর সেই কঠিন পদার্থের গুঁড়ো বাড়ির দেয়ালে লেগে থাকে। প্রায় ৫০০ রকমের কাঁচামাল রঙ তৈরির কাজে লাগে। রঙ বিভিন্ন ধরনের হয়—যেমন ঘর সাজানর রঙ বা ডেকোরেটিভ রঙ, শিল্পে ব্যবহার্য বা ইনডাসট্রিয়্যাল রঙ, জাহাজে লাগানর রঙ বা মেরিন রঙ, ধাতুক্ষয় নিবারণী রঙ বা প্রোটেকটিভ রঙ ইত্যাদি। ভারতে রঙ শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বেশির ভাগ কাঁচামালই আজকাল ভারতে তৈরি হয়। শুধু ১০ ভাগের মতো কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। রঙ নানা প্রকৃতির হয়—যেমন, সহজে মেশে এমন পেন্টস বা এনামেলস, ভার্নিস, শক্ত রঙ বা স্টিফ্ পেন্টস, শুকনো সিমেন্টের রঙ বা ড্রাই ডিসটেমপার, সিমেন্ট পেন্টস, প্লাস্টিক ইমালসন পেন্টস, তেল জাতীয় রঙ প্রভৃতি।'

অর্ণবের মনে আবার প্রশ্ন জাগল, 'আমাদের দেশে কি খুব বেশি রঙ তৈরি হয় না? এই জন্যে বলছি যে, তোমার কথা মতো আমাদের দেশে রঙ কেনার লোকই তো খুব কম।'

মামা একটু স্থির হয়ে উত্তর দিলেন, 'আমি ঠিক সেই কথা বলিনি। আমাদের দেশ আকারে বিরাট। বহু লোকেরই রঙ কেনার সামর্থ আছে। তবে জনসংখ্যার তুলনায় রঙ কেনে এমন লোকের সংখ্যা কম। এ ছাড়া গত ৩০ বছরে ভারতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি তো কিছু হয়েছে; তেমনি রঙ শিল্পেও অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৫১ সালে আমাদের দেশে মাত্র ৩৩,৫০০ টন রঙ তৈরি হয়েছিল; ১৯৭৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৯,৮০০ টনে এবং তা ক্রমশ আরও বাড়ছে। শুনলে অবাক হবি, আমাদের দেশ নিকটবর্তী কিছু দেশে নানান রকমের রঙ—যেমন, আলট্রামেরিন ব্লু, ক্রোম পিগমেন্ট, রেড অক্সাইড, সিন্থেটিক এনামেল, ভার্নিস ইত্যাদি রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে।'

অর্ণব হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, একটা কথা মামা,

তুমি যে বললে রঙের দাম খুব বেড়ে গেছে, এর কারণ কী ?'

মামা সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন, 'পেট্রোলিয়াম জাতীয় কিছু রাসায়নিক বস্তু রঙ-শিল্পে খুব প্রয়োজনীয় ; বিশ্বের বাজারে পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই সব জিনিস তৈরির খরচও খুব বেড়ে যাচ্ছে। যেমন ধর, পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত এসিটোন বা আইছো প্রোপাইল অ্যালকোহল, রঙ-শিল্পে সলভেন্ট বা তরল পদার্থের কাজ করে। এ ছাড়াও অন্যান্য কাঁচামাল যেমন টারপেনটাইন তেল, রুটাইল টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড (এই সাদা পিগমেন্ট সাদা রঙ বানাতে লাগে), গ্লিসারিন ইত্যাদির দামও বেড়েছে।'

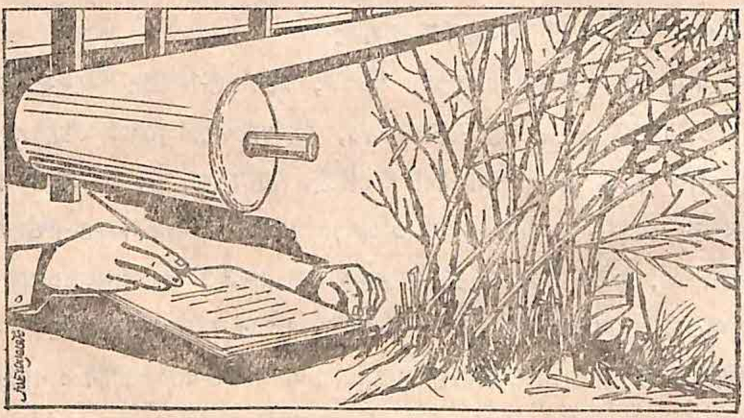
অর্ণব আশ্চর্য হয়ে বললো, 'রঙের দাম বাড়ালে লোকের পক্ষে রঙ কেনা আরও তো অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

মামা বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'ঠিকই, তবে রঙ-শিল্পের বিশেষজ্ঞরা কী ভাবে সস্তা দামে রঙ বানান যায়, সে-ব্যাপারে চিন্তা করছেন। পৃথিবীর কিছু উন্নতিশীল দেশে পেট্রোলিয়াম জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ছাড়াও রঙ তৈরি করা হচ্ছে ; তাতে রঙের দাম কমছে। জলে তৈরি রঙ, কঠিন দ্রব্য জাতীয় রঙ, গুঁড়ো রঙ ইত্যাদি বানান হচ্ছে। আমাদের দেশে ভেষজ তেল—যেমন লিনসিড বা ক্যাস্টর অয়েল—ইত্যাদির উৎপাদন বাড়লে রঙ-শিল্পে এগুলি আরও বহুল ভাবে ব্যবহার করা যাবে। দেশে লাক্ষা ও শেলাকের উৎপাদনও আরও বাড়ান উচিত। রঙ ও ভার্নিশ তৈরিতে এ-সবের খুব প্রয়োজন। আমাদের দেশের সম্পত্তি অর্থাৎ ঘর-বাড়ি, কল-কারখানার মেশিন, জাহাজ, গাড়ি ইত্যাদি যাতে রোদ-বৃষ্টির সংস্পর্শে এসে নষ্ট না-হয়ে যায়, তার জন্যে তাদের গায়ে রঙ লাগাতেই হবে। তাই দেশের উন্নতির সঙ্গে রঙ-শিল্পেরও উন্নতি অপরিহার্য।'

অর্ণবের উৎসাহ ও জানার আগ্রহ দেখে মামার খুব ভলে লাগে। বলেন, 'কাল তোকে একটা সাদা রঙ কিনে দেবো। বাড়ির রঙের সঙ্গে-সঙ্গে গাছের সব টবগুলোতে তুই সাদা রঙ লাগিয়ে দিবি। দেখবি বারান্দায় টবগুলো কী সুন্দর দেখাবে!'

কাগজের ইতিকথা

পড়ার টেবিলে বসে অতনু বড়মামার চিঠির উত্তর লিখছিল। লেখা মনের মতো হচ্ছে না বলে, সে যখন বাবার প্যাডের কাগজ ক্রমাগত একটার পর একটা কেবল ছিঁড়ে চলছে, ঠিক তখন বাবা হঠাৎ ঘরে ঢুকে অতনুকে জিজ্ঞেস করলেন,'এ কী, তুমি এভাবে কাগজ নষ্ট করছো কেন ? তুমি কি জান না, আমাদের দেশে কাগজের এখন কী দুরবস্থা চলেছে—কিছুদিনের মধ্যে কাগজ সংগ্রহ করাই



হয়তো প্রচণ্ড কঠিন হয়ে উঠতে পারে।'

অতনু তো অবাক। দোকানে-দোকানে কত কাগজ বই পড়ে আছে, অথচ বাবা বলছেন যে আমাদের দেশে কাগজের অভাব দেখা দিয়েছে! সে জিজ্ঞেস করল, 'কাগজ যে এত দুষ্প্রাপ্য হতে চলেছে তা তুমি কী করে বুঝলে ?'

বাবা বলেন, 'আমাদের দেশে কাগজের ঘাটতি বেশ কয়েক বছর ধরেই আছে। তাই আমরা বিদেশ থেকে কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট (পত্রিকার কাগজ) প্রতি বছরই আমদানি করছি। তার উপর দেশে এখন কাঁচামালের স্বল্পতার সঙ্গে বিদ্যুৎ ও কয়লার সমস্যা মিশার ফলে

কাগজ প্রয়োজনের চাইতে কম উৎপন্ন হচ্ছে।'

বাবার কথা তেমন বুঝতে না-পেরে অতনু বলল, 'কাঁচা মাল কী ঠিক বুঝলাম না। তাছাড়া কাগজ তৈরির সঙ্গে বিদ্যুৎ ও কয়লার কী সম্পর্ক?'

বাবা তখন ব্যাপারটা তাকে সহজ করে বোঝাতে গিয়ে বললেন, 'তাহলে প্রথমেই জেনে নাও, কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে আহৃত সেলুলস ফাইবারস্ দিয়ে। কাগজ-শিল্প প্রধানত বাঁশ ও কাঠ জাতীয় কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে সর্বমোট যা কাগজ তৈরি হয়, তার শতকরা ৯০ ভাগই কাঠ থেকে। তবে এদেশে কাগজ শতকরা ৮০ ভাগ বাঁশ থেকে ও বাকী ২০ ভাগ আখের ছোবড়া, শুকনো ধানগাছ, পুরনো কাগজ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি থেকে। এ-সব কাঁচামালের ঘাটতি ক্রমশ আমাদের দেশে দেখা দিচ্ছে, অবশ্য সরকার এই পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্যে নানান রকম প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর এই কাগজের মিল সুষ্ঠুভাবে চালানর জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা ও বিদ্যুতের বিশেষ প্রয়োজন। তাই বিদ্যুৎ ও কয়লার সমস্যা দেখা দেওয়ায়, অন্য শিল্পের মতো কাগজ-শিল্পও আজ বিপর্যয়ের মুখোমুখি।'

অতনু বেশ সপ্রতিভ, চালাক-চতুর ছেলে। বাবার আলোচনায় মজা পেয়ে যায়, জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, এই কাগজ প্রথম কোথায় তৈরি হয়, আমাদের দেশে?'

বাবা অনেক পুরনো কথায় ফিরে গেলেন, 'না, এদেশে নয়, কাগজের ইতিহাস শুরু হয় মিশরে। মিশরে লম্বা ঘাস জাতীয় এক রকম গাছ যার নাম C. Papyrus, তার থেকে উৎপন্ন হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম কাগজ। ঐ Papyrus শব্দ থেকে Paper শব্দের উৎপত্তি। আজ থেকে বহু বছর আগে চীনদেশে কাপড়ের কম্বল ও গাছের আঁটি থেকে প্রথম হাতে তৈরি কাগজ উৎপন্ন করেন সাইলুন নামে এক রসায়নবিদ। ধীরে-ধীরে বিজ্ঞানীরা বুঝে গেলেন যে, গাছ জাতীয় কাঁচামাল থেকে কাগজ তৈরি করা সম্ভব।

'আর আমাদের দেশে মোগল রাজত্বের সময়ে প্রথম কাগজ তৈরি হয়। তারপর বৃটিশ রাজত্বে ১৮৩৪ সালে পশ্চিম বাংলার শ্রীরামপুরে প্রথমে মেশিনে কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপিত হলো। কিছুদিন পর এই কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে এখানকার যন্ত্রপাতি বালির রয়েল বেঙ্গল মিলে স্থানান্তরিত করা হয়। দ্বিতীয় কাগজের মিল ১৮৮১ সালে আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিল নামে লক্ষ্ণৌয় স্থাপিত হয়। এর পর টিটাগড়ে এল টিটাগড় পেপার মিল, পুনাতে ডেকান পেপার মিল ও রাণীগঞ্জে বেঙ্গল পেপার মিল। এই ভাবে একটু-একটু ছড়াতে-ছড়াতে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে মিলের সংখ্যা হলো ৮৬টি। তার মধ্যে ১২টি পশ্চিম বাংলায়।'

অতনু আবার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যে বললে আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী কাগজ উৎপন্ন হচ্ছে না, তবে দেশের সরকার আরও কাগজের মিল তৈরি করছে না কেন?'

উত্তরে বাবা বোঝালেন, 'ভারতে কাগজের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে সরকার হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন নামে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গঠন করেছে। ওই সংস্থা ইতিমধ্যে নাগাল্যাণ্ডে ও কেরলে একটা করে কাগজের মিল ও আসামে দুটি কাগজের মিল তৈরি করেছে। কেরলের মিলে নিউজপ্রিন্ট, নাগাল্যাণ্ডের মিলে কাগজ ও পালপ্ (মণ্ড) আর আসামের দুটি কারখানায় প্রিন্টিং ও লেখার কাগজ উৎপন্ন হওয়ার কথা। তবে সবচাইতে জরুরি প্রয়োজন দেশে বাঁশ ও সরল কাঠজাতীয় কাঁচামালের উৎপাদন বাড়ান, সরকার সেদিকেও কিছু নজর দিয়েছে। তবে এ-প্রসঙ্গে এমন সব গাছ ব্যাপক ভাবে রোপণ করা ভাল, যেগুলি কম সময়ের মধ্যে বাড়ে—যেমন, ইউক্যালিপটাস, পাইন ইত্যাদি।'

কাগজ সম্বন্ধে এত কথা জানতে পেরে অতনু বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ওর জানার আগ্রহ দেখে বাবা আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'জানো, আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামের লোকই নিরক্ষর—অবশ্য ওদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্যে সম্প্রতি সরকার, বিশেষত পশ্চিম-

বাংলায়, দেখছি বেশ তৎপর। গ্রামে-গঞ্জে আজ প্রচুর অবৈতনিক স্কুল খোলা হয়েছে। অনেক নৈশ বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, সেখানে বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদেরও পড়ান হয়। যতই এই শিক্ষার প্রসার হবে, আমাদের দেশে ততই কাগজের প্রয়োজন আরও বাড়বে। তাই কাগজের উৎপাদন আমাদের আরও যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াতে হবে। শুনলে আশ্চর্য হবে, কাগজের চাহিদা মানুষ প্রতি আমেরিকায় যেখানে ২৫৭ কিলোগ্রাম, ইংল্যাণ্ডে ১০৬ কিলোগ্রাম, সেখানে আমাদের দেশে তা মাত্র ২ কিলোগ্রাম।'

অতনু বাবাকে প্রশ্ন করল, 'আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যখন এত কাগজ পাওয়া যায়, তখন সেখান থেকে আমাদের দেশে কাগজ আমদানি করা যায় না?'

বাবা বললেন, 'আমাদের দেশে নিউজপ্রিন্ট জাতীয় কাগজ বেশ কয়েক বছর ধরেই তো আমদানি করা হচ্ছে; কিন্তু যতই বাইরে থেকে কাগজ আনবে ততই আমাদের দেশের টাকা বিদেশে চলে যাবে। এছাড়া দেশে কাগজের কারখানা তৈরি করলে প্রচুর লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাও হবে। আর সব চাইতে বড় কথা, কাঁচামালের উৎপাদন না-বাড়ালে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বহু দেশেই কাগজের ঘাটতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।'

অতনুর মনে এরপর শুধু একটা খটকা থেকে যায়। সেটা বাবাকে জিজ্ঞাসা না-করে পারল না, 'কাগজের ব্যাপারে আজ অনেক কথা জেনে নিয়েও কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না, বাঁশ বা কাঠ থেকে কী করে কাগজ তৈরি হয়?'

বাবা বললেন, 'খুব বুদ্ধিমান ছেলের মতো প্রশ্ন করেছ। তোমায় কাগজ তৈরির পদ্ধতিটা সংক্ষেপে বলি শোনো। কাঠ থেকে কাগজ তৈরির এ-পদ্ধতিকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, বাঁশ বা গাছ থেকে কেটে বের করে নেওয়া নরম কাঠের অংশ ঘুরন্ত মেশিনের মধ্যে চালালে; তা থেকে পালপ্ বেরিয়ে আসে; তখন জল ছিটিয়ে, সেই জলের সঙ্গে তাকে খুলে এনে পরিষ্কার করে নেওয়া যায়।

দ্বিতীয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গাছ থেকে যে-পালপ্ বের করে আনা যায়, তা আরও পরিষ্কার হয় এবং তার থেকে ভাল কাগজ পাওয়া যায়।

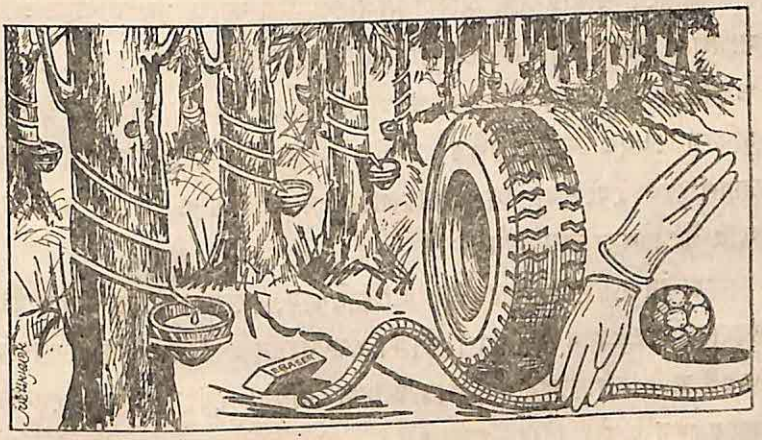
'পালপ্ আবার ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা সম্ভব। যেমন সডিয়াম হাইপোক্লোরাইট নামে রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে এলেই এর রঙ সাদা হয়ে যায়। সাদা পালপ্‌কে মিহি গুঁড়ো করে তার সঙ্গে আরও কিছু রাসায়নিক দ্রব্য সহযোগে জলে মেশানো হয়। সেই জলে গোলা পালপ্ এবার মেশিনের চলমান তারের সূক্ষ্ম জাল-পর্দার মধ্য দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে পালপ্ কাগজে পরিণত হয়। তারপর জল কাগজের শরীর থেকে একটু-একটু করে ঝরে গেলে সে ব্যবহারের চেহারা পায়। সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটিক) ভাবে একটার পর একটা মেশিনে হয়ে যেতে থাকে।'

একটু থেমে বাবা আবার বললেন, 'আজ আর নয়। বড়মামাকে যে-চিঠি লিখছিলে, তা এবার শেষ করো।'

না, আর কাগজ অপচয় না-করে, বড় মামাকে একটা বড় করে চিঠি লিখে ফেললো অতনু। বাবার মুখ থেকে কাগজ সম্বন্ধে যে এত কথা জেনে নিয়েছে সেটাও কিন্তু চিঠিতে লিখতে ভুলল না।

রাবারের কথা

সকাল থেকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল, ক্লাসে অর্ধেক ছেলেই আসেনি। কয়েকজন আবার আসতে গিয়ে ভিজে গেছে। পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস-টিচার বুঝলেন ছেলেদের পড়াশুনো করার তেমন একটা মেজাজ নেই। তাই ক্লাসের পড়া সরিয়ে রেখে তিনি হঠাৎ একজন ছাত্রের রাবার (ইরেজার) তুলে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের আজ রাবারের গল্প বললে কেমন হয় ?'



আনন্দের উত্তেজনায় সমস্বরে সবাই বলল, 'খুব মজা হবে, আমরা রাবারের গল্প শুনবো।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তাহলে মন দিয়ে শোনো। অনেক জ্ঞানীজনের মতে, ১১০০ শতাব্দীতে প্রথম রাবার ব্যবহৃত হয়। একজন ঐতিহাসিক বলেন, ১৫২০ সালে মেক্সিকোর রাজা মন্টেজুমা, হারনেন্‌জে করটেজ ও তাঁর স্পেনীয় সৈন্যদের যে স্পঞ্জের বল দিয়ে এক খেলার মাধ্যমে অভ্যর্থনা করেছিলেন, সেই বলগুলি ওই দেশের এক গাছের আঠা থেকে তৈরি। প্রায় ১০০ বছর পরে যখন ভার্জিনিয়া ইংরেজ দখলে এল, তখন স্পেনের একজন ঐতিহাসিক লিখলেন যে, মেক্সিকোর লোকেরা কোনো এক গাছের আঠা দিয়ে জুতো, কাপড় এবং জলে

নষ্ট না-হয় এমন আরও সব জিনিস বানায়। ১৭৭০ সালে বিখ্যাত ইংরেজ রসায়নবিদ জোসেফ প্রিস্টলে (যিনি অক্সিজেন আবিষ্কার করেন) রাবারের এক নতুন প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেলেন। তখন কিন্তু এই আঠা জাতীয় বস্তুর নাম ছিল মেক্সিকানদের ভাষায় কেওটচোক। কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার এক গাছের কিছু আঠা জাতীয় বস্তু পেয়ে প্রিস্টলে দেখলেন, এই অদ্ভুত বস্তুটি পেন্সিলের দাগের ওপর 'রাব' করলে দাগ খুব সহজে উঠে যায়—তাই তিনি এর নাম দিলেন রাবার। এই রাবারই আজ সারা পৃথিবীর কত রকম কাজে লাগছে।

'প্রথমে রাবার পেন্সিলের দাগ তোলার কাজে খুব ব্যবহৃত হতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে গাড়ির ঢাকনা, কাপড়, মেলব্যাগ, বেলুন ও আরো কত কী বানানর কাজে আজ লাগছে। কাপড়ের মধ্যে রাবার ঢুকিয়ে ১৮২৩ সালে বৃষ্টির কোটও ইংল্যাণ্ডে তৈরি হল। কিন্তু ক্রমশ দেখা যেতে লাগল, রাবার গরমে গলে যায় ও দুর্গন্ধ বের হয়, আর শীতে শক্ত হয়ে যায়।

'চার্লস গুডইয়ার নামে এক আমেরিকান, লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী, রাবার নিয়ে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তিনি এই গবেষণায় এতই জড়িয়ে পড়লেন যে, তাঁর আসল ব্যবসা ফেঁসে গেল। দেনার দায়ে শেষ অবধি তাঁর জেল হল। তবু তিনি আশা ছাড়লেন না। জেল থেকে বেরিয়ে এসে রাবারের সঙ্গে নানান রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে পরীক্ষা চালিয়েও সাফল্য পেলেন না। অবশেষে রাবারের সঙ্গে সালফার মিশিয়ে কোনো নতুন পদার্থ পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করলেন। এই পরীক্ষা যখন প্রায় ব্যর্থ হওয়ার মুখে, তখন সেই ১৮৩৯ সালে একদিন ভুলবশত ওই মেশান গরম পদার্থের কিছুটা স্টোভের ওপর গিয়ে পড়ল। এ-বিপর্যয়ে তাঁর এত দিনের অনুশীলন যেন একটা নিশানা পেয়ে যায়। তিনি লক্ষ্য করলেন, স্টোভের মুখে পড়া পদার্থে রাবারের আঠালো ভাব আর নেই, অথচ তাকে তখনও বেশ মোড়া যায়। তিনি ঘরের বাইরে সারারাত্রি জিনিসটা রেখে

দিলেন—পরদিন সকালে দেখলেন আগের মতো তা শক্ত বা নিরেট হয়ে যায়নি। ১৮৪৩ সালে গুডইয়ার রাবার পরিচ্ছন্ন করার যে-পদ্ধতির পেটেন্ট নিলেন, তার তিনি নাম দিলেন ভালকানাইজেশন —রোমান সভ্যতায় আগুনের রাজা ভালকান-এর নামানুসারে।

'ভালকানাইজেশন আবিষ্কারের একই সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচুর শিল্প গড়ে ওঠে। শিল্পসংস্থায় মেশিন ব্যবহারে রাবারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। রাবার শক্ত করে এঁটে দিয়ে মেশিনের ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা যায়। দুটো যন্ত্রের মাঝখানে রাবার লাগিয়ে তাদের মধ্যে আওয়াজ ও ক্ষয়ের সম্ভাবনা দূর করা যায়। রাবার-তারে মোড়া বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যথেষ্ট নিরাপদ। সাইকেল ও অন্যান্য পুরনো দিনের যানবাহনের টায়ার তৈরির কাজেও রাবারের প্রয়োজন হয়।

'বাড়িতে, শিল্পে, হাসপাতালে, খেলাধুলোয়, কৃষিক্ষেত্রে এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরিতে রাবার বর্তমানে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। টিউব, পাইপ, গাড়ি ও আরো বহু জিনিসের নির্মাণকাজে নরম রাবার জাতীয় পদার্থের দরকার হয়। শক্ত রাবার ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক শিল্পে খুব বেশি, কারণ অ্যাসিড ও গ্যাস ওই রাবারে তৈরি বস্তু কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে না। কারখানা বা অন্যান্য জায়গায় ব্যবহৃত কনভেয়ার বেল্ট রাবার দিয়ে তৈরি। যে-সব পাইপে অ্যাসিড বা গ্যাস জাতীয় বস্তু পাঠান হয় তাতে রাবারের পাড় বা লাইনিং দেওয়া থাকে। নানা ধরনের খেলনা, নরম বিছানা, গ্লাভস, কম্বল, মেসিনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরিতে রাবার এসে পড়ে। জুতো, টুপি, বর্ষাতি ইত্যাদি তৈরি করতে রাবার লাগে। গাড়িতে অসংখ্য রকমের রাবারের দ্রব্যাদি দেখা যায়। গাড়ি ও উড়োজাহাজের টায়ার শুধু নয়, যুদ্ধের অনেক আনুষঙ্গিক দ্রব্য রাবারের সাহায্যে তৈরি। পাহাড়ের চূড়ায় বা জলের নিচেয় যেতেও প্রয়োজন হয় যে-সব সাজসরঞ্জাম, তাতেও রাবার রয়েছে।'

শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার, সব রাবারই কি দক্ষিণ আমেরিকার

জঙ্গল থেকে যোগাড় করা হয়?'

মাস্টারমশাই বোঝালেন, 'না, তা ঠিক নয়, রাবারের চাহিদা সমস্ত পৃথিবীতে এত বেড়ে গেল যে, পৃথিবীর নানান জায়গায় রাবারের গাছ খোঁজার পালা শুরু হল। দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলেই শুধু নয়—খুঁজতে-খুঁজতে মধ্য আমেরিকা, আফ্রিকা, বার্মা, ভারত ও আরো নানা দেশে রাবার পাওয়া যেতে লাগল। শুনলে আশ্চর্য হবে হয়তো, এখন পৃথিবীর প্রাকৃতিক রাবারের ৯৫ শতাংশ পাওয়া যায়—পরে আবিষ্কৃত—শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েৎনাম, কেম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। আমাদের দেশে কেরালায় প্রচুর রাবার গাছের চাষ হয়। ভারতে উৎপন্ন রাবারের শতকরা ৯৪ ভাগ কেরালায় হয়। বাকী ৬ ভাগ পাওয়া যায় তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে। রাবার উৎপন্নে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান পঞ্চম। আর পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বেশি রাবার উৎপন্ন হয় মালয়েশিয়ায়।'

এবার অয়ন সন্দেহ নিরসনের জন্যে জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার, রাবারগাছ থেকে রাবার কীভাবে পাওয়া যায়? রাবারটা গাছের কোন্ জায়গায় জন্মায়?'

মাস্টারমশাই সুন্দরভাবে বোঝালেন, 'মাটি থেকে উঠে-আসা গুঁড়ির ২-৪ ফুট উঁচুতে রাবার গাছের শরীরে খালের মতো ভাঁজ করে কাটা হয়—এই প্রণালীকে ইংরাজিতে টেপিং বলা হয়—যার ফলে, গাছের শরীর থেকে লেটেক্স গড়িয়ে পড়ে। ছয় বা সাত বছরের গাছে প্রথমে টেপিং শুরু করা হয়। বারো বছর বয়সে সেই গাছ লেটেক্স তৈরির ব্যাপারে পূর্ণতা অর্জন করে। একটা ভাল গাছ বছরে প্রায় ২০ লিটারের বেশি লেটেক্স তৈরি করে। তবে সেই গাছের আয়ু সাধারণত ২৫ থেকে ৪০ বছর হয়। লেটেক্সের মধ্যে মাত্র ৩০-৩৫ ভাগ রাবার থাকে, বাকীটা জল ও অন্যান্য বস্তু। সেটা থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রাবার আলাদা করে নেওয়া হয়।'

এরপর অয়ন আবার প্রশ্ন করল, 'স্যার, আগে আপনি প্রাকৃতিক

রাবারের কথা বলেছিলেন, তাহলে প্রাকৃতিক রাবার ছাড়া আর অন্য কোনোরকম রাবারও পাওয়া যায় নাকি?'

মাস্টারমশাই একটু থেমে বললেন, 'খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছ। পৃথিবীর নানান দেশে দিনদিন রাবারের চাহিদা এত বেড়ে গেল যে, শুধু প্রাকৃতিক রাবারে প্রয়োজন মেটানো যাচ্ছিল না। তাই বৈজ্ঞানিকরা লেবরেটরীতে রাবার তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। এছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সৈন্যরা কোনো দেশ থেকে যখন জার্মানীতে রাবার যেতে দিচ্ছিল না, তখন জার্মান বৈজ্ঞানিকরা অনেক পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন যে-ডাইমিথাইল বুটাডাইন নামে এক রাসায়নিক বস্তু—তা বিনা পলিমেরাইজেশন প্রথায় রাবারে পরিণত হয়। ওই রাসায়নিক দ্রব্যের অণুগুলি নির্দিষ্ট তাপে ও চাপে নিজেদের মধ্যে সংমিশ্রণ হয়ে যে-বস্তুর সৃষ্টি করে, তাকে পলিমেরাইজেশন বলা হয়। তারপর যখন জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে ধীরে-ধীরে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন নিজেদের দখলে নিয়ে এল, এইসব দেশ থেকে রাবার আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমেরিকাও রাবার তৈরির কাজে বিশেষভাবে জোর দিল। ক্রমশ দেখা গেল, বুটাডাইন, আইসোপ্রিন নামে রাসায়নিক দ্রব্যাদি পলিমেরাইজেশন প্রথায় রাবারে পরিণত হয়। আরো দেখা গেল, বুটাডাইনকে পলিমেরাইজেশন প্রথায় স্টাইরিন বা একরাইলো-নাইট্রাইল নামক রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে সংমিশ্রণ করালে অধিকতর উঁচু মানের রাবার পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রাকৃতিক রাবারের চাইতে কিছু ভাল গুণ পাওয়া গেল। পরবর্তীকালে নানা গুণবিশিষ্ট রাবার একই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন-ভিন্ন রাসায়নিক বস্তু থেকে কারখানায় তৈরি হতে লাগল।'

শান্তনু আর একটা কৌতূহল নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'স্যার, সারা পৃথিবীতে পরিমাণে কোন্‌টা বেশি—প্রাকৃতিক রাবার, না কারখানায় বানান কৃত্রিম রাবার?'

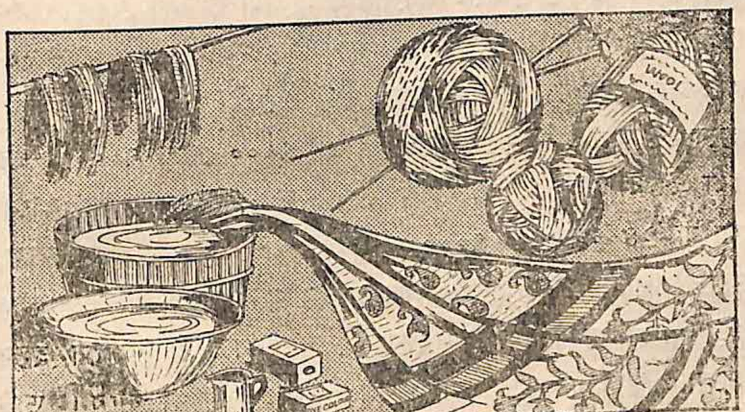
মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন, 'পৃথিবীতে যত রাবার উৎপন্ন হয়,

তার প্রায় ⅔ অংশ কারখানায় তৈরি হয়, আর প্রায় ⅓ অংশ রাবার-গাছ থেকে পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, পৃথিবীতে রাবারের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে, কেবলমাত্র রাবারগাছ থেকে তা আজ মেটান সম্ভব নয়। আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কারখানায় তৈরি রাবারই বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে ভারতে এখনও প্রধানত আমরা প্রাকৃতিক রাবারের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৭৬-৭৭ সালে আমাদের দেশে ১·৫০ লক্ষ টন প্রাকৃতিক রাবার এবং ৩০,০০০ হাজার টন কারখানায় তৈরি রাবার ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রমশ এই উৎপাদন আরো বাড়ছে। কারখানায় উৎপাদিত রাবারের ব্যাপারে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান এখন অষ্টাদশ। উত্তরপ্রদেশের বেরেলীতে স্টাইরিন বুটাডাইন ও গুজরাটের ভাদোদরাতে পলিবুটাডাইন তৈরির জন্যে দুটি কারখানা কয়েক বছর আগে তৈরি করা হয়েছে।'

মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে রাবার সম্বন্ধে এত কথা জেনে ক্লাসের সব ছেলেরা বেজায় খুশি। ক্লাস ছুটি হতে আরো কিছু সময় বাকী আছে দেখে মাস্টারমশাই বললেন, 'যা নিয়ে এত কথা বললাম, এবার তোমরা সবাই খাতা বের করে, তা দিয়ে তৈরি যে-কোনো একটা জিনিস সুন্দর করে এঁকে আমাকে দেখাও তো।'

সব ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে ছবি আঁকতে লেগে গেল।

মিমি জানতো, ওর কাকু বোম্বেতে খুব বড় এক রঙের কারখানায় কাজ করেন। তাই আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো, এবার কাকু এলে ওঁর কাছ থেকে রঙ সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নেবে। ওর কিছু বলার আগেই কাকু এবার পৌঁছে ওকে ফ্যাক্টরীর বেশ রঙীন ও সুন্দর একটি ছোট্ট বই উপহার দিলেন, যাতে নানান রকম রঙ ও কী দিয়ে সেই রঙ তৈরি হয় ইত্যাদি লেখা আছে। সব দেখে মিমি



কাকুকে বললো, 'কাকু, কলকাতায়ও অনেক রঙের কারখানা আছে—এখানে তৈরি রঙ দিয়েই তো আমাদের বাড়ি রঙ করা হয়েছে।'

কাকু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কলকাতার যে-কারখানার কথা তুমি বলছো, সেখানে ঘরে লাগান রঙ বা পেইন্ট তৈরি হয়। আর আমরা যে-রঙ তৈরি করি, সেটা কাপড়ে লাগায়—সেটাকে 'ডাই' বলা হয়।'

মিমি তখন জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু দুটোই তো রঙ—ওদের মধ্যে তফাৎ কী?'

কাকু বোঝাতে আরম্ভ করলেন, 'দ্রাবক বা সলভেন্টের মধ্যে জৈব বা অজৈব বস্তুকে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেওয়া হয়, সেটা তার মধ্যে

সাসপেন্‌সন বা ভাসা অবস্থায় থেকে পেইন্ট জাতীয় রঙ হয়ে ওঠে। কিন্তু ডাই জাতীয় রঙ একটি জৈব বস্তু, যা কিনা অন্য দুই বা ততোধিক বস্তুর সংমিশ্রণে তৈরি হয় আর তা একবার রেশম বা পশমের সংস্পর্শে এলে তাতে লেগে থাকে।'

কাকু হঠাৎ মিমিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো রঙকে লাল বা নীল বা সাদা কেন দেখায় জান কি?'

মিমি চুপ করে আছে দেখে কাকু বললেন, 'আলো একরকম বিদ্যুৎচুম্বকীয় রশ্মি, যা বিভিন্ন স্তরে চলে। মানুষের চোখে ৪০০০ থেকে ৭০০০ এ (১ এ = ১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটার) বিভিন্ন স্তরে বেগুনী থেকে লাল রঙের আলোর রশ্মি ধরা পড়ে। এই লাল রঙের পরই ইন-ফ্রারেড রশ্মি ও বেগুনীর পর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি। যে-কোনো বস্তুকে রঙীন তখনই দেখায়, যখন তা এই ৪০০০ থেকে ৭০০০ এ-এর মধ্যে এক বা একাধিক আলোকে ছেয়ে ফেলতে পারে। যেমন কোনো বস্তু যদি ৪০০০ থেকে ৭০০০ এ মধ্যে সব আলোকে ছেয়ে ফেলে, তাহলে তাকে কালো দেখা যাবে। কিন্তু যদি সেই বস্তু যেমন হলুদ ছাড়া আর সব আলোকে ছেয়ে ফেলতে পারে, তবে সে হলুদ আলো প্রতিফলন করবে এবং ফলে তাকে হলুদ দেখা যাবে। ডাই জাতীয় রঙ সাধারণত এক রঙের আলোকে ছেয়ে ফেলে, যার ফলে সেটা ছাড়া আরো বিভিন্ন স্তরের আলো মিলে আর এক রঙ প্রতিফলন করে।'

মিমি তখন জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কাকু, যে-কোনো রঙীন জৈব বস্তুই ডাই বা রঙের কাজ করতে পারে।'

কাকু উত্তর দিলেন, 'না, তা ঠিক নয়; রঙ সেটাই যা লেগে গিয়ে কাপড় রঙীন করে দেয় এবং সেখান থেকে সহজে আর ওঠে না। জলে ধোয়ার পর বা রৌদ্রে শুকনর পরও না। যে-কোনো রঙীন জৈব রাসায়নিক বস্তুই রঙ নয়, কারণ সেটা কাপড়ে লেগে না-ও থাকতে পারে। এই রঙের চরিত্র কাপড়ের ভিন্নতায় অনেক সময় বদলে যায়। যেমন পিকরিক অ্যাসিড রেশম বা পশমের কাপড়ে হলুদ

রঙ সৃষ্টি করে অথচ তা সুতোর কাপড়ে লাগে না। আবার এমন অনেক রঙ আছে যা অনায়াসে সুতোর কাপড়ে লাগে। পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের মতো রঙ তৈরি হয়েছে, আর এর প্রায় দু' হাজারই এজো জাতীয় রঙ। ১৮৭৬ সালে ও. এন. উইট নামে একজন প্রফেসর প্রথমে লক্ষ্য করেন যে, জৈব রসায়ন বস্তুগুলিতে কিছু অ্যানসেটুরেটেড গ্রুপ রঙীন ভাব সৃষ্টি করে। তিনি এদের নাম দেন ক্রমোফোর (ক্রম-র অর্থ রঙ এবং 'ফোরস্'-এর অর্থ বাহক)। শুধু ক্রমো-ফোর থাকলেই কিন্তু ডাই জাতীয় রঙ হয় না। সঙ্গে থাকা চাই রঙ তৈরির গ্রুপ, যারনাম অক্সক্রোম (অক্স-এর অর্থ বাড়ায়, ক্রোম-এর অর্থ রঙ)। কাজেই যে-জৈব রাসায়নিক বস্তুতে এই দুই গ্রুপ আছে তাকে ডাই বলা যায় এবং তা দিয়ে সুতো, রেশম, পশম ইত্যাদি রঙ করা যাবে। তবে সব রঙ সাবান বা সূর্যের প্রকোপে না-ও টিকতে পারে। লক্ষ্য করবে নীল রঙের পর্দা বা গামছা ক্রমশ রৌদ্রে ফ্যাকাসে হয়ে যায়; তার কারণ এই নীল রঙ সূর্যের তাপকে সহ্য করতে পারে না। তেমনি অনেক কাপড় ধোয়ার সময় রঙ গলে যেতে থাকে—এর কারণ সেই কাপড়ে যে-রঙ লাগান হয়েছে তা সোডা বা সাবানের প্রকোপে কাপড় থেকে উঠে যেতে থাকে।'

মিমি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'কাকু, আগে তুমি তো এজো ডাইয়ের কথা বললে। তার মানে আরো নানান ধরনের রঙ পৃথিবীতে আছে?'

কাকু আবার সুন্দরভাবে মিমিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'নানা রকমের রঙ জৈব রসায়নশাস্ত্রে আছে। যেমন ধরো ডাইরেকট রঙ—যা কাপড়ে সোজা লেগে যায়। এই রঙকে জলে (বা অন্য দ্রাবকে) গুলিয়ে তা একটু গরম করে তার মধ্যে কাপড়কে ডুবিয়ে দিলেই তাতে রঙ লেগে যায়। বেশির ভাগ এজো ডাই রেশম ও পশমের কাপড়ে এইভাবে সহজেই লাগে। তেমনি আবার ইনডাইরেকট (বা মরডেন্ট ডাই) রঙ আছে, যা সোজাসুজি কাপড়ে লাগান যায় না। প্রথমে কাপড়ে অন্য এক রাসায়নিক বস্তু (যেমন আয়রন,

ক্রোমিয়াম এসিটেট ইত্যাদি) লাগান হয়, যাকে মরডেন্ট বলা যায় (ইংরেজিতে 'মরডার'-এর অর্থ কামড়ানো)। তারপর সেটা রঙের জলে চুবিয়ে দিলে সেই রঙ ও মরডেন্ট মিলে কাপড়ের গায়ে একসঙ্গে লেগে থাকে—দুটোর সংমিশ্রণে এক নতুন জটিল রাসায়নিক বস্তুর সৃষ্টি হয়। এছাড়া আছে ইনগ্রেন রঙ এবং ভেট রঙ। ইনগ্রেন রঙ কাপড়ে লাগান হয় অভিনব পদ্ধতিতে—সেই রঙ তৈরি করায় যে দুই রাসায়নিক বস্তু দরকার, তাদের সলিউশনের মধ্যে দিয়ে পরপর কাপড়কে নিয়ে যাওয়া যায়—তাতে দুই রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে রঙ কাপড়ের মধ্যে তৈরি হয়েই তাতে লেগে যায়। ভেট জাতীয় রঙ সডিয়াম হাইড্রোসালফাইটের সংস্পর্শে জলে মিশে যায় (এমনিতে কিন্তু মেশে না)—তাতে কাপড় চুবিয়ে রঙ লাগান হয়। সেই রঙকে তারপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবার আগের অবস্থায় নিয়ে এলে সেটা রঙ হয়ে কাপড়ে লেগে যায়।

'আগেই বলেছি বহু রকমের রঙ পৃথিবীতে আছে। তাদের অ্যাসিড জাতীয় রঙ, খার জাতীয় রঙ, এজো জাতীয় রঙ, সালফার জাতীর রঙ, এনথ্রাকুইনাইন জাতীয় রঙ ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়। সালফার জাতীয় রঙ অনেকটা ভেট জাতীয় রঙের মতো কাজ করে।'

মিমি কাকুকে জিজ্ঞেস করল, 'কাপড়ের রঙের কি বিভিন্ন নাম আছে ? পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের রঙকে নিশ্চয়ই নানান নাম দিয়ে ভাগ করা হয়েছে।'

কাকু বললেন, 'ঠিকই বলেছ। নানান রকম রাসায়নিক বস্তু দিয়ে অসংখ্য রঙ তৈরি করা হয়। যেমন বিসমার্ক ব্রাউন—এম-ফেনিলিন ডায়েমিন ও নাইট্রাস অ্যাসিড থেকে, মিথাইল অরেঞ্জ—সালফেনিলিক অ্যাসিড ও ডাইমিথাইল এনিলিন হাইড্রোক্লোরাইড থেকে, কংগো রেড—বেনজিডিন ও আলফা-ন্যাপথায়োনিক অ্যাসিড থেকে তৈরি করা হয়, তেমনি আরো রঙ যেমন বিবিরচ স্কারলেট, রেসোরসিন ইয়েলো, বাটার ইয়োলো, মিথাইল রেড, মেলাফাইট গ্রীণ, রোজ এনিলিন, মিথাইল ভায়োলেট, ক্রিস্টেল ভায়োলেট, ফ্লোরেসিন,

ফেনলপথিলিন, এলিজারিন বাজারে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশির ভাগ রঙের নামের সঙ্গে সেটা কাপড়ে যে-রঙ সৃষ্টি করে তা জড়িত থাকে। বিভিন্ন রঙের তৈরির প্রণালী বিভিন্ন।'

মিমি সন্দেহ নিরসনের জন্যে আবার কাকুকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের দেশেও কি কাপড়ের রঙ তৈরি হয়?'

কাকু উত্তর দিলেন, 'আমাদের দেশের লোকসংখ্যা খুব বেশি, কাজেই আমাদের প্রচুর পরিমাণ কাপড়েরও দরকার। এখন আমাদের দেশে যে-কাপড় তৈরি হয়, তাতে গড়ে প্রতি মানুষের ভাগে প্রায় ১৪ মিটার করে কাপড় দেওয়া যায়। আরো ১০ বছর পরে আমাদের প্রায় ৭৪ কোটি লোকের জন্য আরো বেশি কাপড় লাগবে। এখনই আমাদের দেশে বছরে প্রায় ৯০০০ মিলিয়ন মিটার কাপড় তৈরি হয়। সিনথেটিক ফাইবারের কাপড়ও বছরে প্রায় ২ লক্ষ টন আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। এত কাপড় তৈরি করে রঙ করতে প্রচুর রঙের প্রয়োজন। আর যত কাপড়ের উৎপাদন বাড়বে, ততই রঙের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

'গত কয়েক বছরে ভারতে কাপড়ের রঙ শিল্পে প্রচুর উন্নতি হয়েছে। ভারতে যে শুধু কাপড়ের রঙের জন্যে রঙ তৈরি হচ্ছে তা নয়, এই রঙগুলি কাগজ, রাবার, প্লাস্টিক, খাদ্য ইত্যাদি রঙ করার কাজেও লাগছে। তার ওপর বিদেশেও প্রচুর রঙ রপ্তানী করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। ভারতে প্রথম বড় ভাবে রঙের কারখানা তৈরি হয় গুজরাটের বালসারে অতুল ডাই প্রডাক্টস নামে। এরা প্রথমে এজো জাতীয় রঙ তৈরি করা আরম্ভ করে এবং পরে সালফার জাতীয় রঙ, অ্যাসিড ও খার জাতীয় রঙ তৈরি করেছে। ক্রমশ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে অমর ডাই-কেম, কালার-কেম, ইণ্ডিয়ান ডাই-স্টাফ, ক্রিছেন্ট ডাইস অ্যাণ্ড কেমিক্যালস, হেস্ট ডাইস অ্যাণ্ড কেমিক্যালস, স্যাণ্ডোস ইণ্ডিয়া, সুদর্শন কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিস নামে বড় বড় অনেক কারখানা গড়ে ওঠে। ভারতে এখন বছরে ২০,০০০ টনের মতো রঙ তৈরি হয়। তবে উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় তিন গুণের

মতো বাড়াতে পারলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা বিদেশে আরো রপ্তানী করতে পারবো ও তাতে প্রায় ৪০০-৫০০ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় অর্জন করা যাবে। রঙ তৈরি করতে নানান রকমের জৈব ও অজৈব রাসায়নিক বস্তুর প্রয়োজন। গত কয়েক বছরে এই সব বস্তুর দাম পৃথিবীর সর্বত্র খুব চড়ে যাওয়ায় রঙের দামও খুব বেড়ে যাচ্ছে। তবে ক্রমশ আমাদের দেশে এই সব রাসায়নিক বস্তু তৈরি হচ্ছে—তাতে রঙ শিল্পের সুবিধে হবে।'

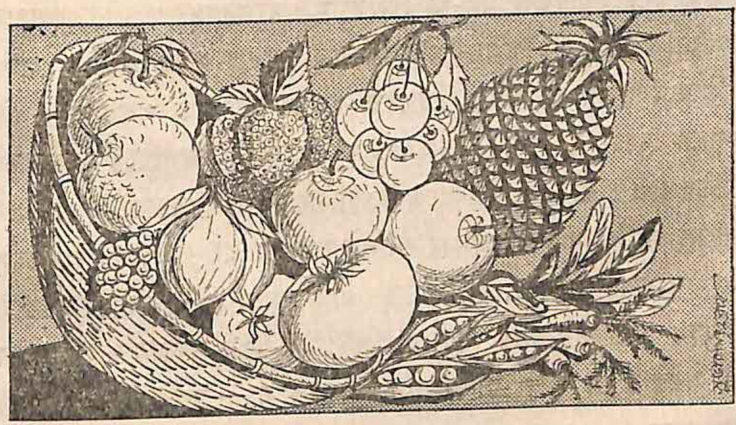
মিমির আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, 'কাকু, আমাদের পশ্চিম বাংলায় রঙশিল্পের কোনো কারখানা নেই কেন?'

কাকু সংক্ষেপে বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গে কাপড়শিল্পের মোটেই উন্নতি হচ্ছে না—তার কারণ এখানের কাপড়ের মিলগুলিকে অন্যান্য প্রদেশ থেকে বেশি দামে কার্পাস তুলো কিনে আনতে হয়। পশ্চিম বাংলায় এই বীজ উৎপন্ন হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত-সরকারকে বহুদিন থেকে অনুরোধ করছে যে, লৌহ ও কয়লার মতো তুলোর বীজের দাম সারা ভারতে এক করে দিলে কাপড়শিল্প দেশের বহু জায়গায় বেড়ে উঠতে পারে। কিন্তু ভারত সরকার এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কিছু করেনি। কাপড়শিল্পের উন্নতি হলেই পশ্চিম বাংলায় রঙশিল্পের উন্নতি হবে। আর এই দুই শিল্পেই তখন প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।'

মিমি ভাবতে আরম্ভ করল পশ্চিম বাংলায় রঙশিল্পের কারখানা হলে, কাকু হয়তো এদিকে চলে আসতে পারেন। আর তাহলে কী মজাই-না হবে।

ভিটামিন-প্রসঙ্গ

নানা অভিজ্ঞার ভেতর দিয়ে দীর্ঘকাল আগেই মানবসমাজ বুঝে নিয়েছে, খাদ্যের সঙ্গে এমন কিছু সামগ্রী বা উপাদান থাকা প্রয়োজন, যা শরীরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এই যেমন দূর সমুদ্রযাত্রী নাবিকদের একদা স্কার্ভি নামে যে এক ভয়ঙ্কর অসুখের সম্মুখীন হতে হতো, একজন স্কচ ডাক্তার জেমস লিন্ড ১৭৫০ সালে পরীক্ষা করে দেখালেন কমলার রস সেবন করলে তা আর হয়



না। লিন্ডের পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়ে বৃটিশ সরকার ১৭৯৫ সাল থেকে বৃটিশ নাবিকদের জন্যে নিয়মিত কমলার রস বরাদ্দ করলেন।

এর কিছুদিন পর একজন ডাচ ডাক্তার ক্রিশ্চিয়ান এইজেকম্যান ইন্দোনেশিয়াতে বেরিবেরি রোগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এই রোগ যে শুধু স্নায়ুগুলির ক্ষতি করে তা নয়, এতে মৃত্যুও হতে পারে। পরীক্ষা-চালিয়ে ১৮৯৭ সালে ডাঃ এইজেকম্যান ঘোষণা করলেন যে, মুরগী ও পায়রাদের কেবলমাত্র পরিষ্কার চাল (যে চালের ওপর থেকে বাইরের ঢাকনা সরিয়ে নেওয়া হয়) খাওয়ালে, তারা বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়। এই সব পাখিদেরই আস্ত চাল খাওয়ালে ওরা আবার সেরে ওঠে। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে-

কোনো জীবাণু থেকে বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হয় না, খাবারে কোনো একটি বিশেষ বস্তুর অনুপস্থিতিতে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এই বস্তুটিই হলো ভিটামিন-বি ১।

পোল্যাণ্ডের রসায়নবিদ্ ফাংক চালের হাস্ক থেকে এক রাসায়নিক বস্তু বের করলেন, যার অনুপস্থিতিতে বেরিবেরি রোগ হয়। এই জৈব রাসায়নিক বস্তু একরকম 'অ্যামিন' নামে পরিচিত। তিনি এর নাম দিলেন ভিটামিন। লাটিন ভাষায় 'ভিটা'র অর্থ জীবন। এই ভিটা ও অ্যামিনের সংযোগে ভিটামিন নামের সৃষ্টি।

ভিটামিন-'এ' নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা অনেকদিন আগেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, ভিটামিন-'এ'র অভাবে চোখের অসুখ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিটামিন-'এ'র অভাবে অনেক সময় কোনো লোক রাত্রিতে নিস্তেজ আলোতে চোখের সমতা আনতে পারে না—এই রোগকে ইংরেজিতে 'নাইট-ব্লাইণ্ডনেস' বলা হয়। ব্যাপারটা সহজভাবে বুঝিয়ে বলি। রাত্রির অন্ধকারে উল্টোদিক থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে কোনো গাড়ি, যদি একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যায়, তারপর দেখবে, সে সামনের রাস্তা আবার ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে। আর যদি তার শরীরে ভিটামিন-'এ'র অভাব থাকে, তবে এই অবস্থায় সে সম্পূর্ণ রাস্তা দেখতে পাবে না—শুধু গাড়ির সামনের সামান্য অংশ দেখতে পাবে।

ভিটামিন-'এ' মাছের লিভারের তেল ও কিছু জন্তুর লিভারের মেদে পাওয়া যায়। গাছের ফলে কিন্তু ভিটামিন-'এ' পাওয়া যায় না।

ভিটামিন-'বি' ১ বা থায়েমিন নিয়ে আগেই কিছু আলোচনা করেছি। এই ভিটামিনের অভাবেই 'বেরিবেরি' রোগ হয়। আস্ত চাল, গমের রুটি, মটরশুঁটি, বিন্ ইত্যাদিতে ভিটামিন-'বি' ১ পাওয়া যায়।

ভিটামিন-বি ২'র অন্য নাম রিবোফ্লেভিন। শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে সব জীবকোষেই এক হলুদ জীবাণু আছে, যার মধ্যে এই ভিটামিন আছে এবং হলুদ গুঁড়োর আকারে একে বেরও করা যায়। ডিম, জীব-

জন্তুর লিভার, টমেটো, অনেকরকম ফল ইত্যাদির মধ্যে ভিটামিন-বি ২ পাওয়া যায়। এই ভিটামিনের অভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। গায়ের চামড়া খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেক সময় চোখেরও ক্ষতি হয়।

নায়েসিন নামে আর একরকম বি-ভিটামিন মানুষের শরীরে প্রয়োজন। ১৮৬৭ সালে নিকোটিনের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে নায়েসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালে প্রমাণিত হয় যে, এই অ্যাসিড একরকম ভিটামিন এবং এর অভাবে পেলেগ্রা নামে এক রোগের সংক্রামণ হয়। আমেরিকায় নায়েসিনকে নিকোটিনিক অ্যাসিড বলা হয়। পেলেগ্রা রোগে শরীরের চামড়া ও ঠোঁট ইত্যাদি লাল হয়ে যায়, ওজন কমে ও পেটের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নায়েসিন থেকে আসা নায়েসিনামাইড (আমেরিকায় বলা হয় নিকোটিনেমাইড) মাংস, লিভার, দুধ, ডিম ও শাকসব্জীতে পাওয়া যায়।

থায়েসিন, রিবোফ্লেভিন ও নায়েসিনের সঙ্গেই আর একরকম ভিটামিন থাকে, যার নাম ভিটামিন-বি ৬ বা পাইরিডোকসিন। সাদা গুঁড়োর আকারে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। শরীরের চামড়া ও স্নায়ুর কাজে এই ভিটামিন সাহায্য করে। ১-২ মিলিগ্রাম ভিটামিন-বি ৬ রোজ আমাদের শরীরের প্রয়োজন।

আরেকরকম বি-ভিটামিন হল পেন্টোথেনিক অ্যাসিড। গ্রীক ভাষায় পেন্টোথেন-এর অর্থ হলো 'সব জায়গা থেকে'। এই ভিটামিন শরীরের মধ্যে নানা প্রকার রাসায়নিক সংমিশ্রণে যোগ দেয়। ভারী তেলের আকারে এই ভিটামিন পাওয়া গিয়েছে। পেন্টোথেনিক অ্যাসিডের অবর্তমানে শরীরে কী ক্ষতি হয়, তা বিশদভাবে জানা যায়নি। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে, জন্তুদের এই ভিটামিন না-খাওয়ালে ওদের শরীর বাড়ে না ; চুলের রঙ পরিবর্তন হয় ও চামড়ায় দাগ দেখা দেয়। লেবরেটরীতে পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যে-সব জন্তুকে এই ভিটামিন খাওয়ানো হয়, তাদের আয়ু অনেক বেড়ে যায়। ডিম, মাংস, ছানা, লিভার, অনেকরকম ফলে পেন্টোথেনিক অ্যাসিড থাকে।

মৌমাছির চাকে যে মধু পাওয়া যায় তাতে এই ভিটামিন খুব বেশি পরিমাণে আছে।

ইতালীর একজন শ্রমিক রোজ শুধু ১২টা করে কাঁচা ডিম ও সঙ্গে মদ খেয়ে কাটাত। শিগগিরই ওর চামড়ার ও চোখের অসুখ দেখা দিল, আমেরিকান বৈজ্ঞানিক নরম্যান জোলিফে এই ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, যখন ডাক্তার এই রোগীকে শুধু কাঁচা ডিম খাওয়া বন্ধ করতে বললেন ও তার পরিবর্তে স্বাভাবিক খাওয়া খেতে বললেন, তখন সে আবার ভাল হয়ে উঠতে লাগল। বায়োটিন বা ভিটামিন-এইচ এই শ্রমিকের শরীর একেবারে পাচ্ছিল না—কারণ কাঁচা ডিমে এভিডিন নামে যে পদার্থ আছে তা বায়োটিনের সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়ে শরীরকে এই ভিটামিন থেকে বঞ্চিত করত। শরীরে নানান রকম খাদ্যের ভূমিকার মধ্যে বায়োটিন যে প্রয়োজনীয় কাজ করে, সেটা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়ে ছিলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক ফিয়োডোর লিনেন। এর জন্য ১৯৬৪ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পান।

ফোলিক অ্যাসিড আরেকরকম ভিটামিন। এই ভিটামিন সর্বপ্রথম পাওয়া যায় শাকসব্জীর মধ্যে। এর অভাবে শরীরে রক্ত ভালভাবে তৈরি হয় না, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা যায়।

রক্ত তৈরির কাজে আর এক ভিটামিন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—তার নাম ভিটামিন বি-৪২ বা সায়কোবালামিন। কোবাল্ট-ধাতু দিয়ে বানান এই রাসায়নিক ফর্মুলাটি এক্সরে প্রণালীর সাহায্যে প্রমাণিত করে ইংল্যাণ্ডের মহিলা রসায়নবিদ ডরোথী ক্রোকুট রসায়নে নোবেল প্রাইজ পান।

ভিটামিন-'সি'র অভাবে যে স্কার্ভি হয় সেকথা আগেই বলেছি। মানুষের শরীরে ভিটামিন-সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন ৩০ থেকে ৮০ মিলিগ্রাম ভিটামিন একজন মানুষের প্রয়োজন। ছোট ছেলেমেয়েদের বেশি করে ভিটামিন-সি খাওয়া প্রয়োজন। কমলালেবু ও অন্যান্য অনেকরকম ফলে, সবুজ শাকসব্জী, বাঁধাকপি ইত্যাদিতে

ভিটামিন-সি থাকে। গাছ ও কিছু জন্তু নিজেরাই শরীরে ভিটামিন-সি তৈরি করতে পারে। ভিটামিন-সি গ্লুকোজ ইত্যাদি থেকে ল্যাবরেটরী বা কারখানায় প্রচুর পরিমাণ তৈরি হয়, তাই এর জন্যে প্রাকৃতিক খাবারের ওপর নির্ভর করতে হয় না। যাযাবরের দৃষ্টিপাত তোমরা পড়েছ কি? তার এক জায়গায় লেখক বলছেন, 'আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।··· কমলালেবুর বদলে ভাইটামিন-সি ট্যাবলেট খাওয়ার মতো।'

ভিটামিন-ডি দুই রকমের হয়—ভিটামিন-ডি ২ যার আরেক নাম আরগোকেলসিফেরল এবং ভিটামিন-ডি ৩ যার নাম কোলেকেল-সিফেরল। শরীরে হাড় তৈরিতে প্রয়োজন ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস। ভিটামিন-ডি এই দুই উপাদানের পরিমাণ যাতে শরীরে প্রয়োজন-মতো থাকে, সেদিকে নজর রাখে। এর অনুপস্থিতিতে ছোট ছেলে-মেয়েদের চেহারা রিকেটের মতো হয়ে যায়। হাড় শক্ত হয় না। এবং হাড়ে অপুষ্ট শিশু যখন হাঁটতে আরম্ভ করে, তখন পা বেঁকে যায়। শরীরের অন্য অংশের হাড়ও শক্ত না-হওয়ায় নানান রোগ দেখা দিতে পারে। ভিটামিন-ডি শুধুমাত্র জন্তুদের মধ্যে থাকে। মাছের (বিশেষত কড বা সার্ক) লিভারের তেলে অধিক পরিমাণ পাওয়া যায়।

মানুষের শরীরে ভিটামিন-ই কী কাজ করে তা এখনও ভাল-ভাবে পরিষ্কার হয়নি। চার রকমের ভিটামিন-ই'কে (অন্য নাম টোকো-ফেরল) গ্রীক অক্ষর—আলফা, বিটা, গামা ও ডেল্টা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। গাছে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়।

ডেনমার্কের রসায়নবিদ হেনরী দাম ১৯২৯ সালে দেখলেন যে, বাচ্চা মুরগীকে যদি ভিটামিন-কে না-দেওয়া যায়, তাহলে তাদের রক্ত দানা বাঁধে না এবং শরীরের নানা অংশে রক্ত ক্ষয় হয়। পরে আমেরিকান রসায়নবিদ এডওয়ার্ড ডোয়জি প্রায় একই রকম আরেকটা বস্তু আবিষ্কার করলেন, প্রথম বস্তুটিকে ভিটামিন-কে ১ ও পরেরটিকে ভিটামিন-কে ২ নাম দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালে এই দুইজন রসায়ন-বিদকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ভিটামিন-কে বীট, গাজর,

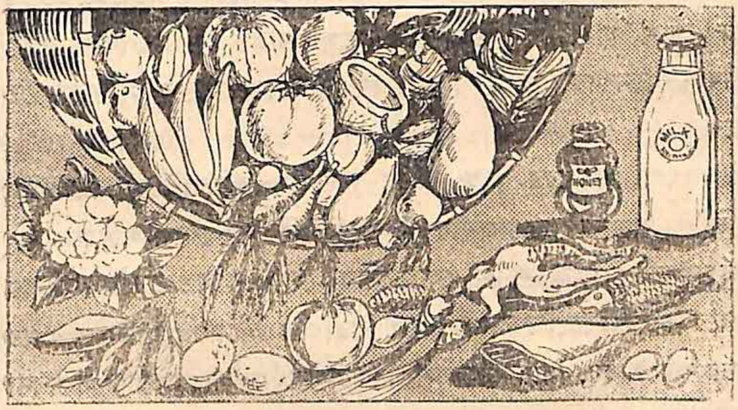
টমেটো, চাল, ছানা ও মাছে পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে ভিটামিনের ইতিহাস তোমাদের বললাম। বড় হয়ে জৈব রসায়নের বই পড়লে আরো বিস্তারিত জানতে পারবে। তোমরা শরীর চাঙ্গা করার জন্যে নানা রকম টনিক বা মাল্‌টিভিটামিন ট্যাবলেট প্রায়ই খাও। এই সব ওষুধে কোন কোন ভিটামিন বা অন্য উপাদান আছে, তা ওষুধের গায়েই লেখা থাকে। যেমন ধর একটা মাল্‌টিভিটামিন ট্যাবলেটের যা আমরা, প্রায়ই খাই, উপাদানগুলি এই রকম :

ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি ১, থায়েমিন অর্থাৎ ভিটামিন-বি ১, রিবোফ্লেভিন বা ভিটামিন-বি ২, পাইরিডোক্সিন বা ভিটামিন-বি ৬, সায়নোকোবালামিন বা ভিটামিন-বি ১২, নিকোটিনামাইড বা আরেক রকম ভিটামিন-বি, ক্যালসিয়াম পেন্টোথেনেট বা আরেক রকম ভিটামিন-বি, এ্যাসকরবিক অ্যাসিড বা ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ই, বায়োটিন বা ভিটামিন-এইচ। এ ছাড়া কয়েক রকমের মিনারেল বা রাসায়নিক পদার্থ এর মধ্যে থাকে। অন্যান্য টনিকের উপাদান যদি পড়ো, দেখতে পাবে, তাদের মধ্যেও প্রায় ওই সব ভিটামিন ও অন্যান্য কিছু রাসায়নিক বস্তু রয়েছে। কোন্‌টা কত পরিমাণ আছে সেটা না-হয় না-ই দেখলে। তবে এই উপাদানগুলি সময় পেলেই পড়বে— তাতে ভিটামিনগুলির নাম ও তাদের প্রয়োজনীয়তা তোমাদের মনে থাকবে।

কোনো খাদ্যই ফেলনা নয়

যে-কোনো খাদ্যবস্তুর মধ্যে এমন কিছু-না-কিছু মূল উপাদান আছে, যা মানুষের শরীরে প্রয়োজন হয়। এই মৌলিক উপাদানগুলি হল কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, জৈব অ্যাসিড বা অম্ল, ভিটামিন, জল ও মিনারেল। সৌভাগ্যবশত এইসব উপাদান আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের কাজ শরীরের চাহিদা মতো এদের বেছে নেওয়া। এদের অভাবে যে-কোনো লোকের



শুধু অসুস্থতাই নয়, মৃত্যুও ঘটতে পারে।

শরীরের শক্তি যোগানোর প্রধান অবলম্বনই হল কার্বহাইড্রেট। শরীরের ভেতরে কার্বহাইড্রেট ভেঙে গিয়ে শক্তির সঞ্চার করে, যা পরিণামে শরীরে তাপের সৃষ্টি করে। এই শক্তি বা তাপকে কেলরির হিসেবে মাপা হয়। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে আসা কার্বহাইড্রেট আসলে চিনি বা সুগারের অণু দিয়ে তৈরি। এদের মনোসেকারাইড বলা হয়। গ্লুকোজ, ফ্রাকটোজ ও গ্যালাক্টোস্ জাতীয় সেকারাইড-এর সাদা দানা খুবই সুস্বাদু ও জলে গুলে যায়। কার্বহাইড্রেট প্রধানত পাওয়া যায় চিনি, ফল, শাকসব্জী, রুটি, ভাত, বালি ও আরো নানান রকমের খাবারে—এই জেলি, জ্যাম, চকোলেট,

মধু, সিরাপ ইত্যাদির মাধ্যমে। দুটো মনোসেকারাইড অণু মিলে ডাই সেকারাইড তৈরি করে—সুক্রোজ (খাবারের চিনি), লেকটোজ (দুধের চিনি) এবং মল্টোজ (মল্টের চিনি) এই জাতীয়। গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজ-এর একটি করে অণু মিলে হয় সুক্রোজ। গ্লুকোজের দুটি অণু একত্রে মিলে হয় মল্টোজ। এছাড়া আছে পলিসেকারাইড, যা তৈরি হয় অনেকগুলি সেকারাইড অণুর সংমিশ্রণে। স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, সেলুলজ এই জাতীয় পলিসেকারাইড। স্টার্চ গাছের বিভিন্ন অংশে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি গ্লাইকোজেন জন্তু-জানোয়রের শরীরে—বিশেষত, লিভারে পাওয়া যায়। সেলুলয়েজ গাছের কাঠে পাওয়া যায়। মনোসেকারাইড সহজেই শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, কিন্তু ডাই বা পলিসেকারাইড শরীরে গিয়ে ভেঙে প্রথম মনোসেকারাইড হয়। তারপর শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশতে থাকে।

আমরা খাবারের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ কার্বহাইড্রেট প্রতিদিন খাচ্ছি। অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি না-খেলে শরীরকে শুধু কার্বহাইড্রেট থেকে শক্তি যোগানোর চেষ্টা করতে হয়। আবার শরীরে কার্বহাইড্রেটের অভাব হলে শরীরকে নিজের প্রোটিনের ওপর নির্ভর করতে হয়, যার ফলে শরীর ক্রমশ রোগা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রোটিন জন্তু জানোয়ার ও গাছের মধ্যে থাকে। শরীরের জীবন্ত কোষ তৈরির কাজে প্রোটিন অবশ্যই দরকার। বহুরকমের প্রোটিন শরীরের মধ্যে থাকে। শরীরের বৃদ্ধি, হরমোন ও এনজাইমের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রোটিন কাজ করে চলে। প্রোটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কখনো সালফার, ফসফরাস, আয়রন বা কপারও থাকে। এমিনো অ্যাসিড জাতীয় রাসায়নিক বস্তু দিয়ে তৈরি এ-প্রোটিন। কোনো-কোনো প্রোটিনে এমিনো অ্যাসিডের অনেক অণু লম্বা হয়ে লেগে থাকে। কার্বনের পরমাণুতে, এমিনো গ্রুপ (নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন নিয়ে তৈরি), কারক্সইল গ্রুপ

(কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে তৈরি) ও হাইড্রোজেন পরমাণু লাগানো থাকলে এমিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হয়।

মানুষের শরীর প্রোটিনকে সোজাসুজি ভাবে ব্যবহার করতে পারে না। প্রোটিন ভেঙে প্রথম এমিনো অ্যাসিড হলে, তবেই তা শরীরের কাজে লাগে। অনেক এমিনো অ্যাসিড শরীরে তৈরি হয়। যে-সব এমিনো অ্যাসিড শরীরে তৈরি হয় না, সেগুলি অবশ্যই বাইরে থেকে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে শরীরে পাঠাতে হয়। এই প্রয়োজনীয় এমিনো অ্যাসিড মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। শাকসব্জী জাতীয় খাদ্য থেকেও প্রোটিন কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। জীবজন্তু থেকে পাওয়া প্রোটিন মানুষের শরীরের প্রয়োজনীয়তা অল্পই মেটাতে পারে ; তবে যারা নিরামিষ আহার করে, তাদের দুধ, ছানা বা যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন থাকা শাকসব্জী খাওয়া দরকার। যে-কোনো লোকের প্রতি কিলোগ্রাম শরীরের ওজনে প্রতিদিন অন্তত ১ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া উচিত। ছোট ছেলেমেয়েদেরও পরিমাণ মতো প্রোটিন খাওয়া দরকার। পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশে মানুষ প্রোটিনের অভাবে নানারকম রোগের সম্মুখীন হয়।

যে-সব এমিনো অ্যাসিড শরীর অবশ্য চায়, তারা হলো লিউসিন, আইছো-লিউসিন, লাইসিন মিথিওনাইন, ফিনাইল এলেনিন, থ্রিওনিন, ট্রিপটোফেন ও ভেলিন। আর যে-সব এমিনো অ্যাসিড শরীরে সহজাত, তারা হল এলেনিন, আর্গিনিন, এসপারটিক অ্যাসিড,সিস্‌টিন, গ্লাইসিন, গ্লুটেমিক অ্যাসিড, হিস্টিডিন, টাইরোসিন প্রভৃতি।

কার্বহাইড্রেটের মতো ফ্যাট বা লিপিডস যদিও কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি, তবু ফ্যাট একেবারে ভিন্ন রাসায়নিক বস্তু। এতে আছে—ফ্যাটি অ্যাসিড যেমন স্টিয়ারিক অ্যাসিড, পাসেটিক অ্যাসিড,অলিয়িক অ্যাসিড প্রভৃতি, যা গ্লিসারোল নামক এক রঙবিহীন তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকে। ফ্যাটের এক অণুতে তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড ও এক অণু গ্লিসারোল আছে। শরীরে আরো

জটিলভাবে এই ফ্যাট অন্যান্য বস্তুর অণুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আবার কোনো-কোনো ফ্যাট যেমন ওলিভ অয়েল, কটনসীড ওয়েল, কর্ণওয়েল তরল আকারে থাকে।

এই ফ্যাট খাওয়ার সময় গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে ভেঙে যায়। এরা হয় শরীরে শক্তি যোগায়, না-হয় ফসফরাসের সঙ্গে ফসফোলিপিড তৈরি করে, যা শরীরের কোষ গঠনের কাজে লাগে। ফ্যাট হিসেবে এরা হয় শরীরের মধ্যে, না-হয় চামড়ার নিচেয় জমে থাকে। চামড়ার নিচেয় যে-মেদ থাকে তা শরীরে তাপমাত্রা সংরক্ষণে সাহায্য করে। যখন শরীর অনেকক্ষণ ধরে কোনো খাবার পায় না, তখন এই জমানো মেদ ভেঙে গিয়ে শরীরকে তাপ ও শক্তি যোগায়। কার্বহাইড্রেটের মতো, ফ্যাট ভেঙে গিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। শরীরের রক্তে কলস্টেরল পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকায় ফ্যাটের ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। যাদের রক্তে কলস্টেরল অধিক পরিমাণ আছে, তাদের ফ্যাট খুব হিসেব করে খেতে হয়। ফ্যাট কিন্তু কার্বহাইড্রেট বা প্রোটিনের চাইতে বেশি শক্তি যোগায়। প্রতি গ্রাম ফ্যাট দেয় ৯ ক্যালরী তাপ, অথচ প্রোটিন বা কার্বহাইড্রেট প্রতি গ্রামে মাত্র ৪ ক্যালরী তাপ দেয়। যারা প্রচুর কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের শরীরে শক্তির বেশি প্রয়োজন। তাই তাদের শরীরে ফ্যাটেরও খুব প্রয়োজন। তবে আবার প্রয়োজনের অধিক ফ্যাট জাতীয় খাদ্য খেলে লোক খুব মোটা হয়ে যায়, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।

সাইট্রিক অ্যাসিড ও মেলিক অ্যাসিড, এই দুই জৈব অম্ল বহু খাদ্যেই আছে। সাইট্রিক অ্যাসিড কমলা, লেবু, আঙুর ছাড়াও অন্য ফলে ও শাকসব্জীতে পাওয়া যায়। শরীরে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাতে অম্লটি সাহায্য করে। মেলিক অ্যাসিডও অনেক ফল, টমেটো, আপেল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এছাড়া দইয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড, কিছু শাকসব্জীতে সাকসিনিক অ্যাসিড; আঙুরে টার্টারিক অ্যাসিড ও কিছু ফলে অক্সেলিক অ্যাসিড থাকে।

শরীরে জলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হয়তো বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ শরীরের ওজনের দুই তৃতীয়াংশই জল দখল করে আছে। শরীরে প্রতি কোষে জলের প্রয়োজন ও শরীরে যে-সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া হচ্ছে তা জলের মাধ্যমেই হচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘাম ইত্যাদিতে প্রতি মুহূর্তে শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই বিশেষত গরম দেশে আমাদের প্রচুর জল খাওয়ার প্রয়োজন। অবশ্য নানান খাদ্যবস্তুর মাধ্যমেও আমাদের শরীরে যথেষ্ট জল যাচ্ছে। তবুও দিনে ছোটদের ৩-৪ গ্লাস ও বড়দের ৬-৮ গ্লাস জল খেলে ভাল হয়।

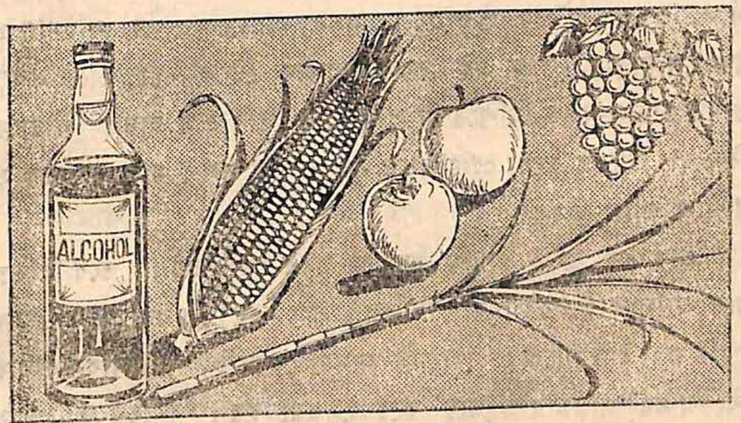
শরীরে আর যে-একটি বস্তুর প্রয়োজন তা হলো নানা মিনারেল বা ধাতু। প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট বা ফ্যাটের মতো মিনারেলগুলি সোজা-সুজি শরীরে শক্তি সৃষ্টি করে না। তবে শরীরে এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যাদের নির্মাণকার্যে এদের ডাক পড়ে। এ-ব্যাপারে খুব প্রয়োজনীয় ধাতু হলো ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রণ, কপার, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়োডিন, ক্লোরিন, সালফার ফ্লোরিন ও ম্যাংগানিজ। এছাড়া আছে কবাল্ট, নিকেল, মলিবডেনাম, জিংক ও অ্যালুমেনিয়াম। শরীরে দাঁত ও হাড়ের সুস্থতা ও বৃদ্ধির কাজে ক্যালসিয়াম খুবই প্রয়োজন। ছোট ছেলেমেয়েদের প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম খাওয়ান উচিত। দুধ থেকে ক্যালসিয়াম ভাল পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্ণ মানুষের দিনে ০·৮ গ্রাম ও ছোট ছেলেমেয়েদের ১ গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। দাঁত ও হাড়ের জন্যে ফসফরাসও খুব জরুরি। উপরন্তু শরীরে যে-সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়, তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফসফরাসের প্রয়োজন। আমাদের প্রায় খাবারেই ফসফরাস বর্তমান—সেই খাবারের সঙ্গে ফসফরাস শরীরে যাচ্ছে। রক্ত তৈরির কাজে শরীরে যে আয়রণের প্রয়োজন, তা মাংস, ডিম, ডাল, কলা ইত্যাদিতে আছে। আয়রণ মিশ্রিত খাদ্যে কপারও থাকে। রক্ত তৈরির কাজে এই কপার অবশ্য সামান্য পরিমাণ লাগে। সডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্লোরিন বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে শরীরে যায়। সডিয়াম ক্লোরাইড যায় লবণের সঙ্গে। শরীরের

কোষে-কোষে এদের প্রয়োজন হয়। বিশেষত প্রচুর ঘাম হলে সডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ কোষের ভারসাম্য আনতে সাহায্য করে। শরীরে থাইরোয়েড গ্লাণ্ডে আয়োডিনের খুব প্রয়োজন। প্রতিদিন ০'১৫ থেকে ০'৩০ মিলিগ্রাম আয়োডিন শরীর চায়। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে সালফার পাওয়া যায়, যা ইনস্থলিন তৈরির কাজে লাগে। ইনস্থলিনের অভাবে ডায়েবেটিস দেখা দেয়। দাঁতের গঠনে ফ্লোরিন জরুরি। ম্যাগনেসিয়াম হাড়ের মধ্যে আছে, তবে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা নেই। আমাদের শরীরের চাহিদা মেটাতে, মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে এখানে বলতে বাকী রইলো খাদ্যে-জড়ানো যে-ভিটামিন, তার কথা তো ভিন্ন আলোচনায় আগেই জেনেছো।

সুস্থ ও সবল থাকতে হলে আলোচিত মূল উপাদানগুলি খাদ্যের সঙ্গে প্রত্যহ শরীরে নেওয়া দরকার। তাইতো রুগ্ন লোকের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে এই সব উপাদান-মিশ্রিত টনিক খেতে বলা হয়।

মদ না, অ্যালকোহল

মদের নাম শুনলে আমরা আঁতকে উঠি বটে, তবু মদ জিনিসটা কী বা কীভাবে তৈরি হয়, তা জানতে আমাদের কৌতূহলও আছে বৈকি। মদের যে-রাসায়নিক নাম ইথাইল অ্যালকোহল, তা কিন্তু আসে বহু রাসায়নিক সংমিশ্রণে এবং যা কিনা, অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু নির্মাণে কাজে লাগে। সাধারণত শুধু অ্যালকোহল নামেই মদ পরিচিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে অ্যালকোহল বলতে নানা রকমে মিশ্র



রাসায়নিক বস্তুকে বোঝায়। গ্লিসারিণ যেমন একরকম অ্যালকোহল, তেমনি ইথিলিন গ্লাইকোল মিথাইল অ্যালকোহল, বুটাইল অ্যালকোহলও ওই একই শ্রেণীতে পড়ে এবং বিভিন্ন রকমের কাজে এদের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে অপরিসীম। মদ তৈরিতে যে-অ্যালকোহল লাগে তার নাম আগেই বলেছি—ইথাইল অ্যালকোহল, আমাদের দেশের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ ঋগ্‌বেদে যে-সোমরসের কথা বলা হয়েছে, তা হয়তো ফারমেনটেশন প্রথায় তৈরি, ইথাইল অ্যালকোহল হওয়ারই সম্ভাবনা।

বার্লি, মল্ট, মলাসেস, আঙুর বা আপেলের জুস ইত্যাদি থেকে ফারমেনটেশন প্রথায় মদ তৈরি হয়। এই ফারমেনটেশন প্রথায় তৈরি

মদ পরিশোধন পদ্ধতিতে পরিষ্কার বা স্বচ্ছ করে বাজারে বিক্রি হয়; আবার অনেক সময় ফারমেনটেশন করে ঠিক যেমনটি তৈরি হয়েছে, তেমনি অবস্থায় বাজারে ছাড়া হয়। যেমন ধরা যাক 'বীয়ার' কেমন করে তৈরি হয়। বালিকে জলে ভিজিয়ে রাখার ফলে ডায়েস্টেজ নামে এক এনজাইম, বালিতে থাকা স্টারচকে মলটোজ ও ডেক্সট্রিনে ভেঙে ফেলে। এরপর সামান্য তাপ দিলে ওই ভাঙা বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই তরল পদার্থকে হপ্ গাছের শুকনো ফুল দিয়ে ফোটালে প্রোটিন নিচেয় নেমে আসে, তাতে একটু গন্ধযুক্ত হয়ে মদ নষ্ট হতে পারে না। এবার ঠাণ্ডা করে তার মধ্যে ইষ্ট জাতীয় জীবাণু ছেড়ে দিলে, ফারমেনটেশন শুরু হয়। যখন অ্যালকোহলের পরিমাণ ৫ শতাংশে দাঁড়ায়, তখন এই তরল পদার্থকে ছেঁকে নিয়ে, তাতে একটু কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে দিলে বীয়ার তৈরি হয়ে যায়। বীয়ারে কিন্তু দশ ভাগের মধ্যে প্রায় সাড়ে নয় ভাগই জল; মাত্র ৩ থেকে ৬ শতাংশ অ্যালকোহল।

প্রায় এই একই প্রথায় অন্যান্য মদও তৈরি হয়। তবে বিভিন্ন মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ বিভিন্ন। এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে এদের তৈরি করা হয়ে থাকে। আগেই আমরা জেনেছি, পরিশোধন প্রথায় বিভিন্ন মদ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে নেওয়া হয়। নিচের তালিকায় বিভিন্ন মদ তৈরির কাঁচামাল ও তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ দেওয়া হলো:

পরিশোধিত মদ			অপরিশোধিত মদ		
মদের নাম	কাঁচামাল	অ্যালকোহলের পরিমাণ শতাংশ	মদের নাম	কাঁচামাল	অ্যালকোহলের পরিমাণ শতাংশ
হুইস্কি	মল্ট	৩৫—৪০	বীয়ার	মল্ট	৩—৬
রাম	মলাসেস	৩৫—৪০	ওয়াইন	আঙুরের রস	৪—১২
ব্রাণ্ডি বা কনিয়েক	আঙুরের রস	৪০—৫০	পোর্ট ও সেরী	আঙুরের রস	১৪—২০
জিন	ভূট্টা	প্রায় ৫০	সাইডার	আপেলের রস	৪—৮

এছাড়া আরো নানান ব্রাণ্ডে মদ বাজারে পাওয়া যায়—যেমন শ্যাম্পেন, ক্লেরেট, রাশিয়ান ভডকা, জাপানী সাকি ইত্যাদি।

ইতিপূর্বে মদ তৈরির ব্যাপারে যে-ইষ্ট শব্দটি ব্যবহার করেছি তার সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া ভাল। ইষ্ট একটি কোষে হয়ে-ওঠা ফাংগাস জাতীয় উদ্ভিদ। অন্যান্য সবুজ গাছের মতো ইষ্ট নিজের খাদ্যদ্রব্য বাতাস ও মাটি থেকে টেনে নেয়। মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে এরা বেঁচে থাকে। বাঁচার জন্য যে-শক্তি যোগানো প্রয়োজন, তা এই সব খাদ্যের চিনি জাতীয় পদার্থ থেকে সংগ্রহ করে। তাই যদি কিছু ইষ্ট গ্লুকোজ-মিশ্রিত জলে ফেলে দেওয়া যায় (২০ থেকে ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) তাহলে কিছুক্ষণ পর জলের মধ্যে বুদবুদ দেখা যাবে। এ-ক্ষেত্রে জলের তাপমাত্রা না-বাড়ালেও অক্সিজেন বেরিয়ে আসার ফলে এই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। গ্লুকোজ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে গিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। এই প্রথাকে ইংরেজিতে ফারমেনটেশন বলা হয়। জটিল রাসায়নিক বস্তু এই প্রথায় সহজতর বস্তুতে এসে যায়। এই ইষ্টকে এনজাইম বলা হয়। আমাদের শরীরে এমনি বহু-রকম এনজাইম খাদ্যবস্তুকে ভেঙে সহজতর বস্তুতে পরিণত করে। এবং সেই সঙ্গে যে-শক্তি নিঃসৃত হয়, তা শরীরকে শক্তি যোগায়। যে-কোনো এনজাইম কিন্তু শুধুমাত্র একটি কাজেই লাগে। যেমন মল্টোজকে কেবলমাত্র মেল্টেজ এনজাইমই ভাঙতে পারে বা গ্লুকোজকে ভাঙতে পারে জাইমেজ। চিনিকে আবার ইনভারটেজ ভেঙে ফেলে গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজে।

এই ফারমেনটেশন প্রথায় বেশির ভাগ অ্যালকোহল আগে তৈরি হত। তবে আজকাল অ্যালকোহল আরো বহু-রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়, যা কিনা, নানা প্রয়োজনীয় জিনিস-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। তাই ইথিলিন থেকে বহুলভাবে ইথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

অ্যালকোহল শরীরে প্রচুর শক্তি যোগায়। একে হজম করার

প্রয়োজন হয় না। তাই যারা মদ খায়, তারা যদি এই সঙ্গে অন্যান্য খাদ্য খাওয়া না-কমায় তবে ক্রমশ মোটা হতে থাকে। অ্যালকোহল মানুষের রক্তের চাপ ও বুকের স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়; লিভারেরও বিপর্যয় আনে। এছাড়া কড়া মদ খেলে মুখ, গলা পেট বা খাদ্য-নালীর টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত করে। অ্যালকোহল মানুষের মস্তিষ্কের সবচাইতে অধিক ক্ষতি করে, তার নানা অংশের কর্মক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। যখন মস্তিষ্কে মদের পরিমাণ ·০৫ শতাংশে দাঁড়ায়, তখন তার যে-অংশ মানুষের বুদ্ধি বা নিয়মানুবর্তিতাকে চালিত করে, তা অকেজো হতে আরম্ভ করে; যখন পরিমাণ তার দ্বিগুণ হয়, তখন মস্তিষ্কের যে-অংশ মানুষের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করে, তা অকেজো হয়ে যায়; যখন পরিমাণ প্রায় ০·২ শতাংশে দাঁড়ায়, তখন মস্তিষ্কের মধ্যস্থানে, যা মানুষের আবেগ প্রকাশে সাহায্য করে, তা অকেজো হয়ে যায়; পরিমাণ আরো বাড়লে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দেয়; পরিমাণ ০·৬ থেকে ০·৭ শতাংশে এলে শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হয়, তাতে এমনকি মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। অ্যালকোহলের সবচাইতে খারাপ দিক হল—যারা নিয়মিত পান করে, তারা ধীরে-ধীরে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এবং নেশার বশে নানারকম ক্ষতিকারক কাজে লিপ্ত হয়। একবার ওই নেশা ধরে গেলে তা ছাড়ান বড় কঠিন কাজ হয়ে পড়ে।

সীমিত পরিমাণে অ্যালকোহল খেলে কিন্তু ক্ষিধে বাড়ে। শরীরে শক্তি যোগাতে পারে বলে অনেক সময় অ্যালকোহল রোগীকে সামান্য পরিমাণে খেতে দেওয়া হয়। ঘুমের উদ্রেক করে বলে অনেক ওষুধেও অ্যালকোহল মেশানো হয়। টনিক জাতীয় ওষুধে দেখবে প্রায়শ সামান্য পরিমাণ অ্যালকোহল মেশানো থাকে। শল্যচিকিৎসায় বীজাণুনিবারণের জন্যেও অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়।

অ্যালকোহল থেকে পাওয়া ইথাইল এস্টার জাতীয় রাসায়নিক বস্তু, সেন্ট ও পারফিউম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যদ্রব্যে সুগন্ধ

আনার জন্যেও এস্টার আমরা ব্যবহার করি।

অ্যালকোহলে বিষ ও তেতোজাতীয় দ্রব্যাদি মিশিয়ে মেথিলেটেড স্পিরিট তৈরি করা হয়। এ-ব্যাপারে ১০ শতাংশ উড্-স্পিরিট বা মিথাইল অ্যালকোহল, পিরিডিন বা ন্যাপথা মেশানো যেতে পারে, এই মেথিলেটেড স্পিরিট রঙ, ভার্নিস ইত্যাদি বানানর কাজে প্রচুর পরিমাণে লাগে। স্পিরিট ল্যাম্প ও স্টোভ জ্বালানর জন্যেও এর দরকার হয়।

অ্যালকোহলের সঙ্গে পেট্রোল ও বেনজিন মিশিয়ে পাওয়ার অ্যালকোহল তৈরি করা হয়, যা গাড়ির পেট্রোলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। রেকটিফাইড স্পিরিট (যাতে ৯৫·৬ শতাংশ অ্যালকোহল ও বাকীটা জল থাকে) কিন্তু পেট্রোলের সঙ্গে মিশে যায় না ; তবে অবিমিশ্র অ্যালকোহল যাতে বিন্দুমাত্র জল নেই, পেট্রোলের সঙ্গে সহজেই মিশে যায়। ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পেট্রোল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তাই এখানে মলাসেস থেকে পাওয়ার অ্যালকোহল তৈরি করার কথা ভাবা যেতে পারে।

স্বচ্ছ সাবান বানাতেও অ্যালকোহলের প্রয়োজন। সাবানকে অ্যালকোহলের মধ্যে গলিয়ে স্বচ্ছ সাবান বানাতে হয়। তেমনি শ্যাম্পো তৈরিতেও অ্যালকোহল জরুরি।

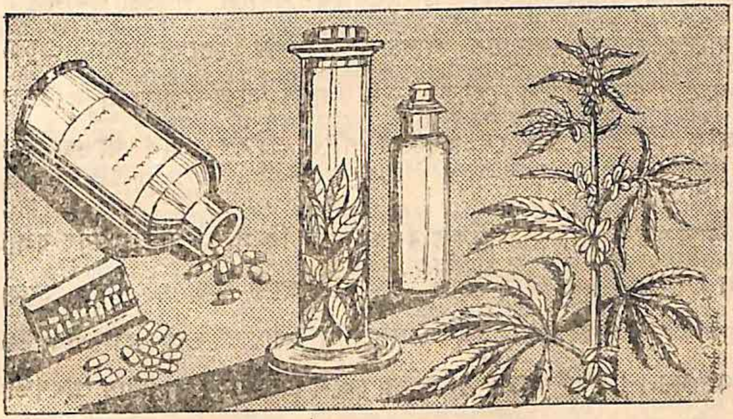
রঙ শিল্পে, রেয়ন তৈরিতে, আরও নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবাংলায় প্রতি বছর শিল্পে ও পানীয়ে ছয় কোটি সত্তর লক্ষ লিটার অ্যালকোহল প্রয়োজন, এর মধ্যে শিল্প-সংস্থাসমূহে লাগে প্রায় পাঁচ কোটি লিটার। ভারতে ইনডাসট্রিয়েল অ্যালকোহল উৎপাদন হয় মহারাষ্ট্রে, উত্তর প্রদেশে, গুজরাটে ও তামিলনাড়ুতে। খরায় আখের উৎপাদন কোনো বছর কম হলে, এই সব প্রদেশ থেকে অ্যালকোহল কম আসে ও ফলে পশ্চিম-বাংলায় বেশ কয়েকটি ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান, গালা শিল্প এবং আরও বেশ কিছু বড় ও মাঝারি শিল্প ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হয়।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন ইথার ক্লোরোফর্ম, অ্যাসেটিক অ্যাডিক, আয়ডোফর্ম ইত্যাদি তৈরিতেও অ্যালকোহল লাগে। ডিটেকটিভ বইয়ে বা হাসপাতালে ক্লোরোফর্ম দিয়ে লোককে অজ্ঞান করার কথা নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছ বা জেনেছ। এই ক্লোরোফর্ম তৈরি হয় অ্যালকোহলের সঙ্গে ক্লোরিনের রাসায়নিক সংমিশ্রণে।

কাজেই বুঝতে পারছ অ্যালকোহল মানেই কিন্তু মদ নয়, যা কেবল নেশায় মাতায়। অ্যালকোহল সভ্য সমাজের কত কাজে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুত, জৈব রসায়নশাস্ত্রে অ্যালকোহল যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাদকতার ওষুধ, কিন্তু ওষুধ নয়

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। মিস জেনেট কুক নামে ২৬ বছরের এক আমেরিকান সাংবাদিককে এক সত্য ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যে সেই বছর আমেরিকার সর্বোচ্চ সম্মান পুলিৎজার প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠায় মিস কুক সেই প্রাইজ নেওয়া থেকে বিরত হন ও ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য নয় বলে তিনি পরে স্বীকার করেন। ঘটনাটি হলো ওয়াশিংটনের রাস্তাঘাটে মাদকতা-



পূর্ণ ওষুধ হিরোইনের ছড়াছড়ি। এবং তা এতই সহজলভ্য যে একজন সাধারণ ব্যক্তি তার বান্ধবীর এক ছেলেকে প্রতিদিন সেই ওষুধের ইনজেকশন দিয়ে তাকে হিরোইনে আসক্ত করে তুলেছিল। এই বিশেষ ঘটনাটি সত্য না-হলেও, এ কথা আমাদের জানা যে আমেরিকার যেখানে-সেখানে হিরোইন জাতীয় মাদকতাপূর্ণ ওষুধ অনায়াসে পাওয়া যায়। ফলে তার ব্যবহার সমাজদেহে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

আজকাল তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে, বিশেষত আমেরিকায় ও ইউরোপে, ওই নারকটিক ড্রাগ বা মাদকতার ওষুধ খাওয়ার ঝোঁক খুব বেশি। শুনলে অবাক হবে, আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে

ক্যানাবিস নামে এক রকম নারকটিক ড্রাগে আসক্ত কিছু ছেলেমেয়ে 'ইন্টারন্যাশনেল ক্যানাবিস এলায়েন্স ফর রিফম' নামে এক সংস্থা তৈরি করেছে। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সংস্থার সদস্যরা হল্যাণ্ডের আমস্টারডামে এক সভার আয়োজন করেছিল। সেখানে ক্যানাবিসকে নারকটিক ড্রাগ হিসেবে গণ্য না-করার দাবী তোলা হয়। ১৯টি দেশ থেকে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি সে-সভায় যোগদান করেছিল। তাদের অনেকেই, আলোচনা চলাকালীনও, ক্যানাবিস খাওয়া থেকে বিরত ছিল না। পৃথিবীর সব দেশের পত্রিকায় এই খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। অথচ এই নারকটিক ড্রাগ এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে নিয়ে যাওয়া ও যেখানে-সেখানে খাওয়া নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে গোয়াতে পাশ্চাত্য দেশের ছেলেমেয়েরা প্রচুর মাদকতার ওষুধ বিদেশ থেকে নিয়ে আসে বলে গোয়া-সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে, সমুদ্রের বীচে এইসব ওষুধ খাওয়া বা ধূমপান করা নিষিদ্ধ।

নারকটিক ড্রাগ বা মাদকতার ওষুধকে কি সত্যি-সত্যি ওষুধ বলা চলে? লোকে ওষুধ খায় রোগ সারাবার জন্যে কিন্তু এই ওষুধ খেলে রোগের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশ আরও খাওয়ার অভ্যেস বা প্রবণতা দেখা দেয়। 'হিপি' সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশে এই ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা এনে দিয়েছে। আমেরিকায় শোনা যায় স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এ-প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই ওষুধ দু' রকমের হয়। একটি লোককে সাময়িকভাবে চাঙ্গা বা উত্তেজিত করে তোলে, অপরটি লোককে একটু-একটু করে নিস্তেজ করে দেয়। কোকো, মেরিজুয়ানা বা ক্যানাবিস, হাসিস বা আমাদের দেশে ভাঙ লোককে উত্তেজিত করে। ওপিয়াম ও ওপিয়াম জাতীয় অন্যান্য বস্তু লোককে নির্জীব করে; অবশ্য অল্প খেলে এই জাতীয় ওষুধ অনেক সময়ে শরীরের ব্যথা-বেদনা কমিয়ে আনে, এমন কি ঘুমের ওষুধ হিসেবেও কাজ করে। কিন্তু বেশি খাওয়া অবশ্যই ক্ষতিকারক।

রসায়নশাস্ত্রে কোকেনকে এক রকম অ্যালকালোয়েড বলা হয়।

আগের দিনে দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা কোকেন খেয়ে নিজেদের চাঙ্গা করত। শরীরের স্নায়ুকে কোকেন সাময়িকভাবে অসাড় করে দেয়। প্রথমে এই ওষুধ ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, মনের ও শরীরের জোর বাড়িয়ে দেয়। কিছু সময় পরে সেই শরীর ও মনকে অসাড় করে আনে। শরীরের তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। কোনো কোনো দেশে এখনও কোকেন অস্ত্র পাচারের আগে কোনো নির্দিষ্ট জায়গাকে অসাড় করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। নারকটিক ড্রাগ হিসাবে এখনও কোকেন বিভিন্ন দেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কোকেন পাউডারকে স্নো বলা হয়। অনেকে একে নস্যির মতো নাকে ব্যবহার করে নেশার আমেজ আনতে চায়। এই কোকেন খাওয়ার পর এত উত্তেজনা আসে যে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তখন খুন পর্যন্ত করতে পারে। এমন অনেক ডিটেকটিভ বই তোমরা নিশ্চয় পড়েছ যেখানে কোকেন খেয়ে অপরাধী খুন করেছে অথবা অধিক পরিমাণে কোকেন খাইয়ে সুস্থ লোককে মেরে ফেলেছে। 'ক্যানাবিস সেটিভা' নামে এক গাছের পাতা ও ফুল থেকে মেরিজুয়ানা নামের মাদকতা ভরা ওষুধটি পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মেরিজুয়ানা নারকটিক ড্রাগরূপে খুবই সমাদর পায়।

হেম্প নামক গাছ থেকে হাসিস্ পাওয়া যায়। মধ্যপ্রাচ্যে এক মুসলমান সম্প্রদায় হাসিস্ খাওয়ার পর লোক খুন করতো। এই হাসিস্ থেকে এদের নাম দেওয়া হয় হাসসাস্‌সিন এবং হাসসাস্‌সিন থেকে কালক্রমে ইংরেজি এস্যাসিন শব্দের উৎপত্তি হয়, যার অর্থ তোমরা নিশ্চয়ই জান—খুনী।

মেরিজুয়ানা সাধারণত সিগারেটের তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ধূমপানের পর যা কিনা মস্তিষ্কের স্নায়ুকে পর্যন্ত উত্তেজিত করে তোলে। দেখা যায় যারা মেরিজুয়ানা খায়, তারা আলো সহ্য করতে পারে না। তাই লক্ষ্য করবে তারা, বিশেষ করে দিনের আলোয়, রঙীন চশমা ব্যবহার করে। এই ওষুধও প্রথমে খুব শক্তি ও আনন্দ যোগায়। কিন্তু পরে ক্রমশ লোককে ঝিমিয়ে দেয়। তখন

আবার এই ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় ; এইসব লোক পরবর্তীকালে আরো কড়া প্রকৃতির ওষুধ, যেমন হিরোইন, খেতে আরম্ভ করে।

যেসব ওষুধ খেলে লোক নির্জীব হয়ে যায় তার মধ্যে ওপিয়াম জাতীয় মরফিন ও হিরোইন উল্লেখযোগ্য। পপিগাছের কাঁচা ফল থেকে পাওয়া রসকে শুকিয়ে ওপিয়াম তৈরি করা যায়। বহু বছর আগে ওপিয়াম নানা রোগের, যেমন মাথাধরা, কানে-না-শোনা, হঠাৎ ফিট্-হওয়া, কুষ্ঠ ইত্যাদিতে, ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হত। তখনকার দিনে ওপিয়াম আমদানী-রপ্তানী করে অনেক দেশই প্রচুর টাকা অর্জন করত। ১৭৬৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত থেকে চীনে ওপিয়াম রপ্তানী শুরু করে। বেহুঁশ হয়ে চীনের লোকেরা ওপিয়াম এত বেশি খেতে আরম্ভ করলো যে, চীন সরকার এই ওপিয়াম আমদানী একসময় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এশিয়া মহাদেশে এখনও আফিং খাওয়া খুবই প্রচলিত। আমাদের দেশে সাধুদের মধ্যে আফিংয়ের সমাদর সুবিদিত। স্বয়ং মহাদেবই নাকি সব সময় আফিং খেয়ে চুর হয়ে থাকতেন। পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য মরফিন ও হিরোইনের প্রচলন অধিক।

শুনলে অবাক হবে, মরফিন নামটা গ্রীসের স্বপ্নের দেবতা মরফিয়াস থেকে এসেছে। মরফিন খেতে তেতো লাগে বটে, কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ব্যথা-বেদনা দূর হয় ও ঘুম এসে যায়, আজও ব্যথা-বেদনার ওষুধ হিসেবে মরফিনের নাম উল্লেখযোগ্য। এমনকি পেটের অসুখ, সর্দিকাশি, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি রোগেও মরফিন ব্যবহৃত হয়। মরফিন খাওয়ার অসুবিধে হল ধীরে ধীরে মানুষের মনে এই ওষুধ মাদকতার আকর্ষণ সৃষ্টি করে ; পরে একে পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে ওঠে। সব চাইতে মাদকতাপূর্ণ ওষুধ হিরোইনকে ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করাও বিপজ্জনক। এই ওষুধ নস্যির মতো নাক দিয়ে বা ইনজেকশনের সাহায্যে শরীরে নেওয়া হয়। আপাতত, আরামদায়ক ঘুম আনে। কিছু পরেই যখন রোগী বিষাদগ্রস্ত হয় তখন হয়তো এই ওষুধের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হয়। যারা নিয়মিত হিরোইন সেবন করে

তারা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং পরিণামে তাঁদের অনিদ্রা জাতীয় ব্যাধি দেখা দেয়।

তোমরা অনেক ঘুমের ওষুধের নাম বোধহয় শুনেছ—যেমন ক্যামপোস্, পেক্নাম ইত্যাদি। এই সব ওষুধকে রসায়নশাস্ত্রে বারবিটিউরেটস্ বলা হয়। এগুলি সবই নারকটিক ড্রাগের আওতায় পড়ে।

পত্রিকায় তোমরা দেখে থাকবে জাহাজ-বন্দরে অথবা বিমান-বন্দরে নানারকম মাদকতার ওষুধ, যেমন হাসিস্, মেরিজুয়ানা, মরফিন্ বা হিরোইন, পাচার করার সময় অনেক লোক ধরা পড়ে। কখনো গ্রেপ্তার হয়ে তাদের হাজত বাসও হয়। নিষিদ্ধ পথে অন্য দেশে পাঠিয়ে প্রচণ্ড মুনাফা লুটবার জন্যে অমন বে-আইনী পাচার কাজে তারা লিপ্ত হয়। অনেক ফিল্মেও হয়তো তোমরা এই রকম নাটকীয় পরিস্থিতি উপভোগ করেছ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে ইন্টারন্যাশনাল নারকটিকস্ কন্ট্রোল বোর্ড পৃথিবীর সব দেশকেই মাদকতার ওষুধ প্রচলনের বিরুদ্ধে সতর্কতা নিতে বহু রকমের পরামর্শ দিয়েছে। এই বোর্ডের ডাকে অনেক দেশ বেশ সাড়া দিয়েছে। আমাদের দেশেও পপির (আফিং) ক্ষেত ১৯৭৮ সালের ৬৩, ৬৮৫ হেকটার থেকে ১৯৭৯ সালে ৫২, ০৮১ হেকটারে কমান হয়েছে। তাতে দেশে আফিং-এর চাষ ১৫৪৬ টন থেকে ১৩৮৭ টনে নেমে এসেছে। তবে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিয়মে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে আফিমের চাষ পরে আবার হয়তো বাড়তে পারে। শুধু দেখতে হবে যাতে আফিং মাদকতায় ব্যবহৃত না-হয়।

মাদকতার ওষুধে আসক্ত লোকেদের কী ভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়, তা নিয়ে কখনো ভেবেছ কি ? প্রকৃতপক্ষে এই সব রোগীদের সম্পূর্ণ সুস্থ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তাই সবচাইতে বড় পদক্ষেপ হবে যাতে লোকে মাদকতার ওষুধে আসক্ত না-হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যে-সব গাছ থেকে মাদক বস্তু সংগ্রহ করা যায়, তাদের চাষ ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে। তাছাড়া টনিক ওষুধ

ও তার আদান-প্রদানের ওপরও কড়া নজর রাখতে হবে। রাস্তাঘাটে যারা মাদক বস্তু খেয়ে থাকেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের বহু দেশে এইসব সফট ড্রাগকে আইনকানুনের আওতা থেকে রেহাই দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই সব চাপের কাছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা বিভিন্ন দেশের সরকারের নতিস্বীকার করা সমীচীন হবে না।

সিগারেট খাওয়া কি খারাপ?

শান্তনু বাবার পাশে বসে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে খেলছিল। বাবা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট ধরিয়ে একটা বই পড়ছিলেন। এমন সময় একটা প্যাকেট উল্টেপাল্টে কী দেখে শান্তনু বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, এটা কী লেখা আছে সিগারেট প্যাকেটের গায়ে!'

বাবা বই থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'সিগারেট স্মোকিং



ইজ ইনজুরিয়স টু হেলথ্।'

—'তার মানে?' শান্তনুর চোখ বাবার দিকে।

বাবা বললেন, 'মানে—সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।'

শান্তনু বলে, 'কিন্তু এ-কথা লেখা আছে কেন?'

ছেলের প্রশ্নে তার জানার উৎসাহ দেখে, বাবা আঙুলের ফাঁকে বইটা মুড়ে নিয়ে বললেন, 'বিজ্ঞানী ও ডাক্তারেরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন অতিরিক্ত সিগারেট খেলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমাদের সরকারী স্বাস্থ্যদপ্তর ঠিক করল যে, সিগারেট প্যাকেটের গায়ে এই কথা লিখে লোককে সতর্ক করে

দেবে। সেই থেকেই এটা লেখা হল।'

—'তাহলে সিগারেট খাওয়া সত্যিই খারাপ, না বাবা?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'আগেই বলেছি সিগারেট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়া গলা ও ফুসফুস প্রণালীতে সিগারেটের ধোঁয়া লেগে কাশি ও ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সিগারেট অতিরিক্ত খেলে ক্ষিদে নষ্ট, ঘুমের ব্যাঘাত, বদহজম, বুককাঁপা, দম কমে যাওয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।'

শান্তনু বলল, 'তাহলে লোকে সিগারেট খায় কেন? এই যে রাস্তায় হাজার-হাজার লোক, প্রায় সবার হাতেই তো দেখছি সিগারেট জ্বলছে!'

বাবা বললেন, 'সিগারেট খেলে লোকে অল্প সময়ের জন্যে মনে এক আনন্দ পায়—এই তোমার চকোলেট খাওয়ার মতো আর কী। লক্ষ্য করে দেখবে, অনেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় সিগারেট ধরিয়ে নেয়—তাতে কাজে একাগ্রতা আসে।'

এক মনে শুনছিল শান্তনু। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বাবা, সিগারেটের তামাক কী ভাবে প্রথম আবিষ্কার হল—বলো না?'

এবার একটু চিন্তা করে নিয়ে উত্তর দিলেন রাজীববাবু, 'নিকোটিয়ানা নামে এক গাছের পাতা থেকে সিগারেটের তামাক পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বাস যাওয়ার আগেই সেখানে এই তামাকের চাষ হত। সেই দেশে এই গাছ ও যে-পাইপে তামাক খাওয়া হত, তাকে টাবাকো বলা হত—তাই থেকেই ট্যবেকো শব্দের উৎপত্তি। কলম্বাস নাকি কিউবা থেকে কিছু তামাক স্পেনে নিয়ে এসেছিলেন। ক্রমশ নাকি পর্তুগালে এই তামাক আমদানী করা হয়। সেখান থেকে আবার ফরাসী দূত ডিনে নিকোট ১৫৬০ সালে কিছু বীজ ফ্রান্সে পাঠান। নিকোট নাম থেকে তামাক গাছের নাম হয় নিকোটিয়ানা। এবং এই থেকে তামাকের মধ্যে যে-রাসায়নিক বস্তু বা এলক্যালয়েড আছে, এর নাম হয়ে আসে নিকোটিন; পরে

ইংল্যাণ্ডে ও ধীরে ধীরে পৃথিবীর বহু দেশে তামাকের ধোঁয়া পান খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যে মেয়েরা আগে ধূমপান করত না—কিন্তু আজকাল মেয়েরাও করে ও অনেক মহিলার ভ্যানিটি ব্যাগে সিগারেটের প্যাকেট দেখা যায়।'

শান্তনু একটু চিন্তা করে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'সিগারেট খেলে কি কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'সিগারেটের ধোঁয়ায় নিকোটিন তো আছেই, এ ছাড়াও এই ধোঁয়ার সঙ্গে বেরোয় পিরিডিন, এমোনিয়া, কার্বন-মনোক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জৈব অম্ল, কিটোন ও এলডিহাইড জাতীয় রাসায়নিক বস্তু। কাজেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে বৈকি। আর বেরোয় তামাকের অবশিষ্ট বা ট্যবেকো টার, যার থেকে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে আসা যে-সব রাসায়নিক বস্তুর নাম করলাম, তা থেকে গলা ও ফুসফুসের ব্যথা ইত্যাদিও হতে পারে।'

—'তাহলে নিকোটিন কি মানুষের শরীরে ক্ষতি করে?'

বাবা একটু চিন্তা করে বললেন, 'নিকোটিন বর্ণহীন তরল পদার্থ, কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে এলে চকোলেটের মতো রঙ হয়। ধোঁয়ার সঙ্গে এটা ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে শরীরের ভেতরে যায়। শরীরের মধ্যে যা নিকোটিন যায়, তার ৫ থেকে ১৫ শতাংশ প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাকীটা শরীরের ভেতর ভেঙে গিয়ে ছোট্টো রাসায়নিক দ্রব্যের সৃষ্টি করে। শরীরে লিভারের মধ্যে নিকোটিন সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। খুব জোরে ধোঁয়া টানলে নিকোটিন বেশি পরিমাণে শরীরের ভেতরে যায়। সামান্য নিকোটিন মানুষের মস্তিষ্ককে কিছুটা সজীব করে তোলে। কিন্তু অধিক পরিমাণ নিকোটিন মস্তিষ্কে ও ফুসফুসের স্নায়ু ইত্যাদিকে অসাড় করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া নিকোটিন শরীরে প্রস্রাব তৈরির কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে ও শরীরের রক্তের চাপে তারতম্য ঘটায়। চামড়ায় রক্তের চলাচল কমে আসে। ফলে শরীরের অংশবিশেষে তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

খুব বেশি ধূমপান করলে, অনেক সময় লোকের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। ধূমপান বন্ধ করে দিলে দৃষ্টিশক্তি আবার ঠিক হয়ে আসে। নিকোটিন পেটের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পেপটিক অ্যালসার রোগের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে। যাদের এই রোগ আছে, তাদের ধূমপান না-করাই ভাল—নিকোটিন এদের অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।'

শান্তনু এবার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, ধূমপান থেকে যে ক্যান্সার হতে পারে, এটা কী করে বিজ্ঞানীরা বুঝলেন?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'পৃথিবীর সব জায়গার বিজ্ঞানীরা প্রায় এক মত যে, অতিরিক্ত ধূমপান থেকেই ফুসফুসে ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিশ্বাসের কারণ হল :

১. ধূমপান ও ক্যান্সার রোগ দুটোই দিন দিন বাড়ছে।

২. যাদের ফুসফুসে ক্যান্সার হচ্ছে, তারা অনেকেই ধূমপান করে থাকে।

৩. জন্তু-জানোয়ারকে গাঢ় তামাকের রস খাইয়ে দেখা গিয়েছে, তাদের ক্যান্সার রোগ হচ্ছে।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি, যারা দিনে বিভিন্ন পরিমাণ সিগারেট খায় তাদের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনার ওপর ইতিমধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তালিকায় এই জাতীয় লোকদের প্রতি লক্ষ মানুষের মধ্যে মৃত্যুর হিসেব দেওয়া আছে।

যারা ধূমপান করে না	১২·৮	পরিমিত ধূমপান করত এখন করে না	৫৬·৩
দিনে ১০টা পর্যন্ত সিগারেট খায়	৯৫·২	দিনে ১০-২০টা সিগারেট খায়	১০৭·৮
দিনে ২০-৪০টা সিগারেট খায়	২২৯·২	দিনে ৪০-এর ওপর সিগারেট খায়	২৬৪·২

আমাদের দেশের স্বাস্থ্য আমেরিকানদের চেয়ে অনেক খারাপ। তাই আমাদের দেশে এই জাতীয় পরীক্ষা করলে আরও খারাপ ফল হয়তো পাওয়া যাবে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পৃথিবীর নানান জায়গায় বৈজ্ঞানিকেরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে এসেছেন।

১. যে সব লোক ধূমপান করে না তাদের ফুসফুসে ক্যান্সার খুব একটা হয় না।

২. যে সব লোক ধূমপান করে, তাদের অনেকের ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে মৃত্যু হয়। যে কোনো লোক যত বেশি ধূমপান করবে, ততই তার অসময়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ে।

৩. ধূমপান ছেড়ে দিলে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।'

বাবা একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'দুই আমেরিকান ডাক্তার ডাঃ হ্যামণ্ড ও ডাঃ হর্নও পরীক্ষা করে দেখেছেন, ধূমপানের ফলে শুধু যে ফুসফুসে ও তার ধারে কাছে ক্যান্সার হয় তা নয়, লিভারের অসুখ, বুকের অসুখ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া ও অ্যালসার রোগও দেখা দিতে পারে। যারা ধূমপান করে না, তাদের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার ব্যাপারে এঁদের মত হল, যারা ধূমপান করে তাদের ছাড়া ধোঁয়া ও শহরের দূষিত বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃতভাবে শরীরে টেনে নিয়ে তারা এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ১৯৫৬ সালে ইংল্যাণ্ডে ডঃ ডল ও হিল পরীক্ষা করে এই একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। সিগার বা পাইপ দিয়ে ধূমপান করলে অথবা ফিলটার লাগান সিগারেট খেলে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা নাকি অনেকটা কমে।

সিগারেট টানায় যে-আমেজ তা হয়তো লোক সহজে ছাড়তে পারবে না। সিগারেট কোম্পানিও যে-রকম আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন চারিদিকে ছড়াচ্ছে, তাতেও লোক আকৃষ্ট হয়। তাই সরকারী প্রচারের মাধ্যমে এবং স্কুল কলেজের পড়াশোনার ভেতর দিয়ে অল্প

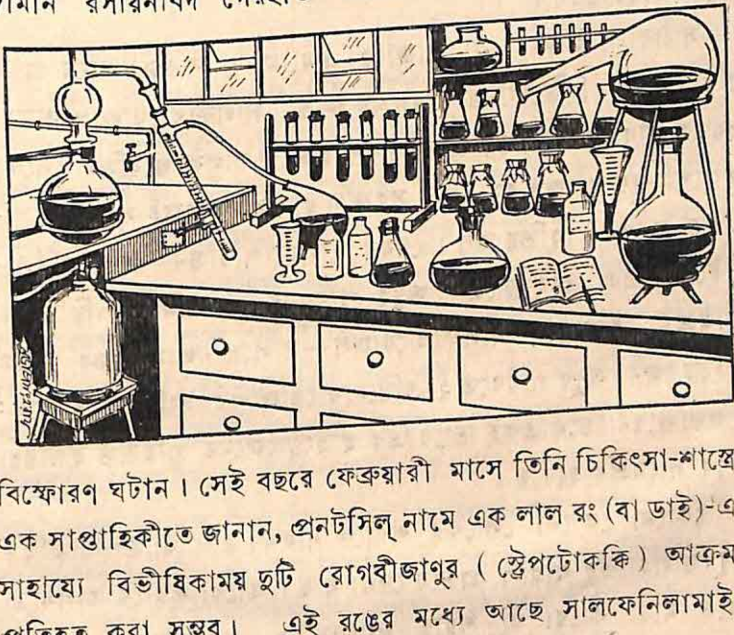
বয়সেই ধূমপানে আসক্ত হওয়ার খারাপ দিকটা তুলে ধরলে ভাল হয়। সিগারেটে যে-নিকোটিন ও তামাকের অবশিষ্ট টার আছে সেটা যে কত ভাবে মানুষের শরীরে অনিষ্ট করতে পারে, তা প্রতিটি লোককে জানতে হবে। ধূমপানে অভ্যস্ত, এমন কোনো লোকের যদি গলা খুসখুস করে বা অনবরত কাশি হতে থাকে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এ ছাড়া ওজন-কমা, বুকব্যথা, রক্তবমি, শ্বাসকষ্ট, রাত্রে ঘাম-হওয়া, গলার স্বর বদলে যাওয়া ইত্যাদিও খারাপ লক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করলে ফুসফুসের ক্যান্সার অনেক সময়ই নিরাময় করা যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্থা ওয়ারলড্ হেলথ্ অর্গানাইজেশন পৃথিবীর সর্বত্র ধূমপান কমানর জন্যে নানা ভাবে চেষ্টা করছে, ওদের সাম্প্রতিক শ্লোগান হল: ধূমপান না স্বাস্থ্য—কোন্‌টা আপনি চান?'

শান্তনু এতক্ষণ সব মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ এবার বাবাকে বলল, 'বাবা, এত জেনেও তুমি তাহলে সিগারেট খাচ্ছ কেন? তুমি কাল থেকে আর সিগারেট খাবে না কিন্তু।'

বাবা এবার হাসলেন। একটু হাসি মুখেই শান্তনুর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

রোগ নিরাময়ে রসায়নের অবদান

এমন অসংখ্য রকমের রাসায়নিক বস্তু আজ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দিয়ে নানা জীবাণু থেকে আমাদের শরীরে-আসা রোগজীবাণু অনায়াসে ধ্বংস করা যায়, অথচ শরীরের কোষের কোনো অনিষ্ট হয় না। রোগের বীজাণু ধ্বংস করার এই প্রথাকে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আরলিক কেমোথেরাপি নামে অভিহিত করেন। ১৯৩৫ সালে জার্মান রসায়নবিদ গেরহার্ড ডমেগ কেমোথেরাপির জগতে এক



বিস্ফোরণ ঘটান। সেই বছরে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের এক সাপ্তাহিকীতে জানান, প্রনটসিল্ নামে এক লাল রং (বা ডাই)-এর সাহায্যে বিভীষিকাময় দুটি রোগবীজাণুর (স্ট্রেপটোকক্কি) আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব। এই রঙের মধ্যে আছে সালফেনিলামাইড নামে এক রাসায়নিক দ্রব্য। মানুষের শরীর বীজাণুর প্রভাবে যে সব রোগ হয় তাদের প্রনটসিল্ দিয়ে কি ধ্বংস করা যায় না?

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রনটসিল্ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেল। ফরাসী বৈজ্ঞানিকরা জার্মানী থেকে এই লাল রঙের দ্রব্যটি আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তারপর তাঁরা নিজেরাই তা দেশে তৈরি করে নিয়ে তার নাম দিলেন রুবি। এই ওষুধ জন্তু-জানোয়ারের ওপর

ব্যবহার করে দেখা গেল, এতে তাদের দেহে জীবাণু থেকে আক্রান্ত রোগ সেরে যাচ্ছে। এবং তাঁরাই প্রথম প্রমাণ করলেন, প্রনটসিলের মধ্যে যে-সালফেনিলামাইড নামক রাসায়নিক বস্তু আছে, সেটাই এই জীবাণুদের ধ্বংস করছে। আমেরিকায় জনস হপকিনস্ স্কুল অফ মেডিসিনের বৈজ্ঞানিক এলি মার্শাল (জুনিয়র) সালফেনিলামাইড দিয়ে মানুষের শরীরে বীজাণুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে যে-গবেষণা শুরু করেন, তার ফলে অনেক কঠিন রোগে সালফেনিলামাইড ব্যবহার শুরু হল। বাজারে সালফা ড্রাগ নামে অজস্র রকমের ওষুধ ছড়িয়ে গেল।

সালফাপিরিডিন (যা বাজারে এম অ্যাণ্ড বি ৬৯৩ নামে প্রথম পরিচিত হয়) নিউমোনিয়া রোগের জন্যে, সালফাথায়েজোল আরো ভয়ঙ্কর জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে,সালফাগুয়েডিন পেটের অসুখের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সবগুলি রাসায়নিক বস্তুই সালফেনিলামাইড গ্রুপেরই বিভিন্ন রূপ। যেমন সালফাপিরিডিন—সালফেনিলামাইডের এক হাইড্রোজেন অণুর পরিবর্তে ২-এমিনোপিরিডিনের সংমিশ্রণ হয়েছে, সালফাথায়োজল—সালফেনিলামাইডের এক হাইড্রোজেন অণুর পরিবর্তে ২-এমিনোথায়োজলের সংমিশ্রণ হয়েছে; সালফাগুয়েনাডিনে একই ভাবে এক হাইড্রোজেনের পরিবর্তে ইউরিয়া অণুর সংমিশ্রণ হয়েছে।

কোনো কোনো লোকের শরীরে সালফা ড্রাগ বা উপরিল্লিখিত ওষুধগুলির কিছু খারাপ প্রভাব দেখা যায়। কারো শরীরে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, কারো বা শরীর চুলকায় ও সেই অংশ লাল হয়, কারো আবার বুকে বা তলপেটে ব্যথা দেখা দেয়। এই সব লোকদের সালফা জাতীয় ওষুধ সাবধানে খাওয়া উচিত।

ম্যালেরিয়া রোগ প্রশমনের জন্যে বাজারে এল কুইনাইন নামক ওষুধ। ক্রমশ প্লাজমোকুইন (বা পেমাকুইন), ম্যাপাক্রিন, প্রোগুয়েনিল (বা পেলুড্রিন) নামক আরও কিছু রাসায়নিক বস্তু তৈরি করা সম্ভব হয়, যেগুলি ম্যালেরিয়া জাতীয় রোগে ব্যবহৃত

হতে শুরু হয়। ম্যালেরিয়া জাতীয় রোগ পৃথিবীর অনেক দেশেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে! আমাদের দেশে কোনো কোনো শহরে ম্যালেরিয়া আবার দেখা দিচ্ছে। তবে এই রোগ সারান আজকাল তেমন কঠিন কাজ নয়। কুইনাইন জাতীয় ওষুধ বাজারে প্রচুর পাওয়া যায় এবং দামও খুবই সস্তা।

আর্সেনিক নামক ধাতুর সংমিশ্রণে কিছু আর্সেনিক্যাল ড্রাগও মানুষের অসুখে ব্যবহৃত হয়। সিফিলিস জাতীয় রোগ দমনে সলভারসন ৬০৬ বা আর্সফিনেমাইন খুবই ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক আরলিক, ৬০৬ বারের প্রচেষ্টায়, এই রাসায়নিক বস্তু তৈরি করেন বলে একে সলভারসন ৬০৬ নাম দেওয়া হয়েছিল। 'এটক্সিল' নামে আর একটি ওষুধ ঘুম না-হওয়া জাতীয় রোগে ব্যবহৃত হয়।

তারপর শুরু হল এন্টিবায়োটিকের যুগ। এই সব রাসায়নিক বস্তু যে শুধু বিভিন্ন জীবাণুর উৎপত্তি প্রতিহত করে তা নয়, অনেক সময় এদের ধ্বংসও করে ফেলতে পারে। অনেক জীবাণু আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তু প্রস্তুত করে, যেগুলি অন্য জীবাণুর বিস্তার প্রতিরোধ করে এবং কখনো ওদের ধ্বংসও করে দেয়। এই সব রাসায়নিক বস্তুকে এন্টিবায়োটিক বলা হয়। প্রথম যে এন্টিবায়োটিক পৃথিবীর সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করল তার নাম পেনিসিলিন—পেনিসিলিয়াম নটেনাম নামক এক জীবাণু একে তৈরি করে। ১৯২৮ সালে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং দেখতে পান, তিনি যে-জীবাণু উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন তা পেনিসিলিয়াম নটেনাম নামক জীবাণুর সংস্পর্শে বেড়ে ওঠে না। তিনি আবিষ্কার করলেন পেনিসিলিয়াম নটেনামের মধ্যে পেনিসিলিন নামক এক রাসায়নিক বস্তু আছে যা রোগ সৃষ্টি করে এমন অনেক জীবাণুকে বাড়তে দেয় না। ফ্লেমিং এই বিষয়ে বেশি আর গবেষণার কাজে অগ্রসর হলেন না। বেশ কিছু বছর পর স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরে, ই. বরিস চেইন প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জীবাণু-আক্রান্ত নানান রোগে পেনিসিলিনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৪১ সালে এই

ওষুধ মানুষের অসুখে ব্যবহৃত হয় এবং চাঞ্চল্যকর ফল পাওয়া যায়। সেই বছরই ফ্লোরে আমেরিকায় গিয়ে এই ওষুধ আরো বহুলভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করলেন এবং আমেরিকান সরকারের সাহায্যে পেনিসিলিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্ষত ও জখম হওয়া সৈনিকদের সুস্থ করার কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। পেনিসিলিন সাধারণত ইনজেকসনের সাহায্যে মানুষের শরীরে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো ওষুধ হিসেবে খাওয়া হয়। ব্রংকাইটিস, মেনিনজাইটিস, টনসিলাইটিস, টিটেনাস ও আরো নানান রোগে ব্যবহৃত হয়। ঘা, পোড়া, জখম ইত্যাদিতেও পেনিসিলিন ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে অনেক পুরনো প্রবাদ—বিষে বিষক্ষয়। পেনিসিলিন এবং এই জাতীয় ওষুধ যেন সেই চিন্তাধারাকে রূপ দিয়েছে।

পেনিসিলিনের পর আর একটি এন্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হল, যার নাম স্ট্রেপটোমাইসিন। ১৯৪৩ সালে রাটগার্স ইউনিভারসিটিতে সেলম্যান এ. ওয়াকসম্যান ও তাঁর ছাত্র আলবার্ট স্কয়টজ মাটিতে জন্মায় এমন এক জীবাণু থেকে, স্ট্রেপটোমাইসিন বের করেন। টি.বি. বা যক্ষ্মারোগে, মেনিনজাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগে স্ট্রেপটোমাইসিন অব্যর্থ ওষুধ। এই ওষুধ পেনিসিলিন থেকে অনেক কড়া প্রকৃতির এবং শরীরে কখনো কখনো খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে বাজারে এল ক্লোরোমাইসেটিন (ক্লোরোএমফেনিকল); এই রাসায়নিক বস্তু তৈরি করে স্ট্রেপটোমাইসিস ভেনেজুয়েলি নামে মাটিতে থাকা এক জীবাণু। ক্লোরোমাইসেনটিনকে ব্রড-স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক বলা হয়। এই ওষুধ পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিন থেকে কড়া এবং অনেক বেশি রকমের জীবাণুর বিস্তার বন্ধ বা ধ্বংস করতে পারে। ক্লোরোমাইসেটিনের রাসায়নিক ফরমূলা খুবই সহজ। কারখানাতেই তৈরি করা হচ্ছে। টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি রোগে এই ওষুধ অব্যর্থ কাজ করে। ক্রমে ওরিওমাইসিন এবং টেরামাইসিন আবিষ্কার হল। এরাও ব্রড-স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক। টেরামাইসিন যক্ষ্মারোগে অব্যর্থ ওষুধ।

নিওমাইসিন শরীরে চর্মরোগে, চোখের রোগে ইত্যাদিতে খুব ভাল ফল দেয়। ভায়োমাইসিন যক্ষ্মারোগর ওষুধের সঙ্গে মেশান যেতে পারে। বেসিট্রাসিন ক্ষত বা ওই জাতীয় অসুখে ভাল কাজ দেয়। তবে এই ওষুধ খাওয়ান উচিত নয়, তাতে কিড্‌নি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে।

জন্তু-জানোয়ারের চিকিৎসায়ও এন্টিবায়োটিক ভাল ফল দেয়। এছাড়া জন্তু-জানোয়ারের দ্রুত শরীর বৃদ্ধিতে এই সব ওষুধ খুব কাজ করে। তাই এদের খাদ্যের সঙ্গে অনেক সময় সামান্য পরিমাণ এই ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়। গাছে ও গাছের ফল ইত্যাদিতে অনেক রকম অসুখ দেখা যায়, যার চিকিৎসায়ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যায়। এমনও দেখা যায় যে সামান্য পরিমাণ টেরামাইসিন অনেক খাদ্যশস্য জাতীয় গাছের দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

এন্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ ব্যবহারে কিছু খারাপ দিকও আছে। অনেক রকম জীবাণুকে এরা ধ্বংস করতে পারে না, যার জন্যে অন্য রকম ওষুধের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেক এন্টিবায়োটিক নির্দিষ্ট রোগ সারিয়ে আবার শরীরে কখনো কখনো ভিন্নতর উপসর্গ নিয়ে আসে। ব্রড-স্পেকট্রাম জাতীয় এন্টিবায়োটিক পেটের মধ্যে থাকে এমন অনেক প্রয়োজনীয় জীবাণুর বিস্তার বন্ধ করে দেয়, তাদের আবার কর্মঠ করার জন্যে টনিক জাতীয় ওষুধ খেতে হয়। এন্টিবায়োটিক বেশি খেলে রোগের জীবাণুগুলি ক্রমশ এদের প্রকোপে দমে না-যাওয়ার ক্ষমতা গড়ে তোলে, তবে এখনো পর্যন্ত এন্টিবায়োটিক মানুষের বিভিন্ন রোগে বিশেষ কার্যকরী।

মানুষের শরীরে দিন দিন কিন্তু আরো সব বিচিত্র অসুখ ধরা পড়ছে। এমনি এক রোগ হল পলিও। ছোট ছেলেমেয়েদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা প্রচুর। এই রোগে একবার আক্রান্ত হওয়ার পর সম্পূর্ণ সেরে ওঠা কঠিন; কিন্তু আক্রান্ত না-হওয়ার জন্যে বিশেষ ওষুধের সাহায্যে এই রোগকে প্রতিহত করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল, পোলিওর জীবাণু যখন শরীরের সংস্পর্শে

আসে, তখন শরীরে তাদের বাধা দেয়ার এক রাসায়নিক বস্তু তৈরি হয়, যাকে এন্টি-বডিস বলা হয়—এই জাতীয় বস্তু তৈরি করায় বৈজ্ঞানিকরা মনোনিবেশ করেন। ডাঃ জোনাস সল্ক এই ওষুধ তৈরি করার জন্যে পোলিওর জীবাণুকে বাঁদরের কিডনীর কোষের মধ্যে বাড়তে দিলেন। তারপর জীবাণুকে ফর্মেলিন দিয়ে মেরে ফেলে সেই ওষুধ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, পোলিও'র যে-তিন রকম জীবাণু মানুষের শরীরের কোনো অংশকে নিস্তেজ করে দিতে পারে, তারা এতে ৭ মাস বা তার কিছু বেশি সময়ের জন্যে অকেজো হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৬০ সালে সিনসিনাটি ইউনিভারসিটির ডঃ এ. বি. সবিন এক ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন যাতে উপরিল্লিখিত পোলিও জীবাণুকে না-মেরে জীবন্ত রেখে দেওয়া যায়। এবং তার ফলে যা-কিনা শরীরের মধ্যে এন্টি-বডিস তৈরির কাজে সহায়তা করে। এই ওষুধ অন্তত ২-৩ বছর পর্যন্ত শরীরে পোলিও রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

এমনি করে ট্রিপল এন্টিজেন এল। এল বসন্ত ইত্যাদি রোগের জন্যেও প্রতিষেধক ওষুধ।

শরীরের হরমোন দিয়ে চিকিৎসার পদ্ধতি ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকদের আকৃষ্ট করল। বৈজ্ঞানিক এডওয়ার্ড কেনডেল ও টেডিয়াস রেইক-স্টেইন আলাদা ভাবে কাজ করে এড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড থেকে বেশ কিছু হরমোন উদ্ধার করলেন। করটিসোন নামে এমনি এক হরমোন বাত জাতীয় রোগ সারাতে খুবই অব্যর্থ বলে দেখা গেল। হাইড্রোকরটি-সোনও এই রোগে খুব কাজ করল। বাত জাতীয় অন্যান্য রোগেও করটিসোন ও হাইড্রোকরটিসোন ব্যবহৃত হল। তবে দেখা গেল যে এই ওষুধ রোগকে শুধু চেপে রাখতে পারে, সম্পূর্ণ সারাতে পারে না। এ ছাড়া খুব বেশি এই ওষুধ খেলে শরীরে অন্য রকম কিছু খারাপ উপসর্গ দেখা দেয়। চর্মরোগ, চোখের অসুখ ইত্যাদিতে এই ওষুধগুলি ব্যবহার করা যায়। বৈজ্ঞানিকরা এই জাতীয় হরমোন ল্যাবরেটরীতে তৈরি করার চেষ্টা করছেন। এতে যে শুধু ওষুধের দামই কমবে তা নয়, আরো নানান রকমের হরমোন জাতীয় ওষুধ তৈরি করার

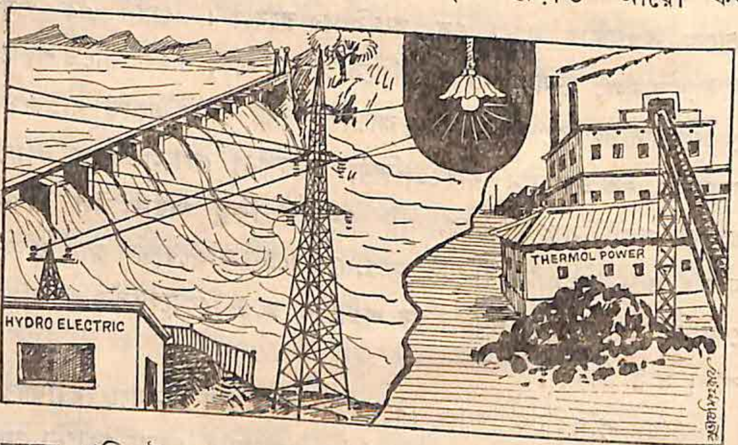
সুযোগ আসবে, যা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অগ্রগতিতে খুবই সাহায্য করতে পারে।

মানুষের শরীরে কোলেস্টেরল এক প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু —শরীরের কোষে ও রক্তের মধ্যে থাকে। রক্তের মধ্যে যে-লাল কোষ আছে তাদের জীবাণুর বিষ ও অন্যান্য দূষিত বস্তু থেকে রক্ষা করে এই কোলেস্টেরল। কিন্তু কোলেস্টেরল যখন রক্তের মধ্যে বেড়ে যায়, তখন এর প্রভাবে রক্তের চলাচল বাধা পায়, তাতে অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই শরীরের রক্তে কোলস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে তাকে কমানোর নানা ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। এমনি এক ওষুধ ট্রাইপেরানল, কোলেস্টেরল কমিয়ে রাখে বটে, কিন্তু তাতে শরীরে ডেসমোস্টেরল বেড়ে গিয়ে কিছু ঝামেলার সৃষ্টি করে। এছাড়া থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের এক হরমোন থাইরোক্সিন, যা কিনা কোলেস্টেরল কমিয়ে রাখতে খুবই সাহায্য করে, এই ওষুধেও কিছু খারাপ ফল পাওয়া যায়। তবে বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করে, দেখেছেন থাইরোক্সন জাতীয় অন্য কোনো আরো ভাল ওষুধ দিয়ে শরীরের রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে রাখা যায় কিনা।

সারা পৃথিবীকে আজ বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে ক্যান্সার। ক্যান্সার জাতীয় রোগকে সম্পূর্ণ নিরাময় করার তেমন কোনো ওষুধ এখনো মানবসমাজের জানা নেই। বহু দেশের বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য এ-রোগের ওষুধ উদ্ভাবনে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সাফল্য এসে, মানুষের চোখে আজ যে-অসহায়তার অন্ধকার, তা সরিয়ে দেবে। বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা আমাদের এই কথাই বলে।

শক্তি-উৎপাদনের উৎস

হঠাৎ ক্লাসে লোড সেডিং হয়ে গেল। শীতের দিন ; বাইরে কিছুটা আবছা অন্ধকার। অষ্টম শ্রেণীর মাস্টারমশাই অশ্বিনীবাবু ছেলেদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'তোমরা সবাই জান, কলকাতা শহরে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং বেশ কিছুদিন ধরে শত চেষ্টা করেও, ঘাটতি পূরণের চাপ সরকার সামলে উঠতে পারছে না। এই বিদ্যুৎ ছাড়াও আরো কত



রকমের শক্তি-উৎপাদন করা সম্ভব, তা কি তোমরা জান? শক্তি উৎপাদনে যাতে ঘাটতি দেখা না দেয়, তার জন্যে শুধু এখানে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশে আজ বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এস, আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি।'

ক্লাসের ছাত্র জয়দীপ আমতা-আমতা করে বলল, 'স্যার, শক্তি-উৎপাদন বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

অশ্বিনীবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, গাড়ি চালাতে, ট্রেন ইঞ্জিন চালাতে, কারখানায় নানা রকম মেশিন চালাতে, ক্ষেত-খামারে ট্রাকটর, প্যাম্প ইত্যাদি চালাতে, এরোপ্লেন ও আরো

অসংখ্য যানবাহন চালাতে, এমন কি আলো জ্বালতে, পাখা ঘোরাতেও শক্তির প্রয়োজন। বহু বিচিত্র উৎস থেকে এই শক্তি-উৎপাদনের উপাদান আহরণ করা হয়। মাটির নীচ থেকে পেট্রোলিয়াম জাতীয় তেল পাওয়া যায়, সঙ্গে প্রচুর গ্যাসও। অনেক সময় মাটির নীচে তেল না-ও থাকতে পারে, কিন্তু গ্যাস প্রচুর পরিমাণ জমানো থাকে। এই গ্যাসকে জ্বালানির কাজে ব্যবহার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই জোর প্রচেষ্টা চলছে। মাটি ছাড়া সমুদ্রের নীচেও পেট্রোলিয়াম ও ন্যাচরেল গ্যাস পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম বা গ্যাস আহরণের পদ্ধতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জানা আছে, কিন্তু এই পদ্ধতি কার্যকরী করা খুবই ব্যায়বহুল। শক্তি-উৎপাদনের আরেক সামগ্রী কয়লা, যা কিনা পৃথিবীর বহু দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া গাছ-গাছড়া থেকে পাওয়া যায় জ্বালানী, মাটির নীচে থেকে গরম বাষ্প বা গরম জলের উৎস, গোবর থেকে জ্বালানী। হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্টে জল থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন, বাতাসের সাহায্যে শক্তি-উৎপাদন, সূর্যের তাপে শক্তি-সৃষ্টি ইত্যাদি প্রথা বর্তমান। ভাবলে আশ্চর্য হবে, বৈজ্ঞানিকরা এখন আরো নতুন প্রথায় শক্তি-উৎপাদনের চেষ্টা করছেন। যেমন সূর্যের তাপে যে-বাষ্প তৈরি হয়, তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি, স্যাটেলাইট থেকে মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে সূর্যের তাপশক্তি আহরণ করা, সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি-সংগ্রহ করা, জলের তাপমাত্রার তারতম্য ও লবণতা থেকে শক্তি-সঞ্চয় করা এবং জল ও মাটির বহু নীচেয় যে-তেল ও গ্যাস রয়েছে, তা থেকে শক্তি-সৃষ্টি করা।'

আরেকজন ছাত্র দেবজিৎ দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'স্যার, আমাদের দেশে কি এই সব রকমে শক্তি-উৎপাদন করা হয়?'

মাস্টারমশাই দেবজিতের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পৃথিবীর সর্বত্র এই সব ধরনের জ্বালানী থাকা সম্ভব নয়; তাই যে-দেশে যে-জ্বালানী সংগ্রহের সুবিধা আছে, সেখানে সেই উৎস থেকে শক্তি-আহরণ ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এছাড়া যে-সব শক্তি-উৎপাদনের

কথা আগে বললাম, তার বেশ কয়েকটা প্রথা নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

'আমাদের দেশে শক্তির প্রধান উৎসই হল কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। হিসাব মতে আমাদের দেশে প্রায় ৮১,০০০ মিলিয়ন টন কয়লা মাটির নীচে মজুত আছে। বর্তমানে দেশে প্রতি বছরে ১০০ মিলিয়ন টনের কিছু বেশি কয়লা উৎপন্ন হয়। সেই সঙ্গে আরো নতুন কয়লাখনি আবিষ্কার করার চেষ্টাও চলছে। আশা করা যাচ্ছে, ষষ্ঠ যোজনার শেষে ভারতে কয়লার উৎপাদন ৫০ শতাংশ বেড়ে প্রায় ১৬৪ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, আমাদের দেশে যা কয়লা মজুত আছে, তাতে প্রায় একশো বছর দেশে কয়লার ঘাটতি হবে না।

'ভারতে পেট্রোলিয়াম বা অপরিশোধিত তেল মাটির নীচে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়নি। ভারতে পেট্রোলিয়াম জাতীয় অপরিশোধিত তেলের চাহিদা এখন ৩০ মিলিয়ন টনের কিছু বেশি, অথচ সম্প্রতি দেশে মাত্র ১৯ মিলিয়নের মতো অপরিশোধিত তেল পাওয়া গিয়েছে। তবে দেশে যে-ভাবে তেলের চাহিদা বাড়ছে, তাতে আরো প্রচুর তেল উৎপাদন করা প্রয়োজন।'

এমন সময় জয়দীপ আবার প্রশ্ন করল, 'স্যার, বাংলা ও বিহারে অনেক কয়লার খনি আছে জানি, কিন্তু ভারতের আর কোথাও কি কয়লা পাওয়া যায়? আবার পেট্রোলিয়ামও আসামে প্রচুর পরিমাণে আছে, কিন্তু আর কোথাও পাওয়া যায় কি ?'

অশ্বিনীবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'জয়দীপ, তোমার জানবার আগ্রহ দেখে ভাল লাগল। বাংলা ও বিহার ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে যথেষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কিছু কিছু কয়লা পাওয়া যায়। কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামক ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া সব চাইতে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা) ভারতে কয়লা-উৎপাদন ও বন্টনের দায়িত্ব নিয়েছে। দুঃখের বিষয়, যদিও সরকার এখন পর্যন্ত এই সংস্থায়

প্রায় ২০০০ কোটি টাকা খাটিয়েছে, তবু তা লোকসানে চলছে। তবে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড লোকসান কমানোর জন্যে আরো উৎপাদন ও সুষ্ঠুভাবে কয়লা-বন্টনে মনোনিবেশ করেছে। ১৯৮১-৮২ সালে তারা কিছু মুনাফাও করেছে। প্রায় ৩০টি নতুন প্রজেক্টে কয়লা-উৎপাদন বাড়ানোর কাজ, লৌহশিল্প ও বিদ্যুৎশিল্পে সময়মতো কয়লা পৌঁছে দেওয়া, কয়লার বন্টন ব্যবস্থা জোরদার করা ইত্যাদি দায়িত্ব ওরা নিয়েছে। কয়লা-শিল্পে লোকসান কমানোর জন্য কয়লার দামও অনেকাংশে বাড়ানো হয়েছে।

'আসাম ছাড়া গুজরাট ও জলের নীচে বোম্বে হাই থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণ করা হয়। ১৯৮০-৮১ সালে দেশে উৎপাদিত প্রায় ১৩ মিলিয়ন টন তেলের মধ্যে ৫ মিলিয়ন টন বোম্বে হাই থেকে পাওয়া গিয়াছে, বাকীটা আসাম ও গুজরাট থেকে যোগাড় করা হয়েছে। বোম্বে হাই-এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছরে বাড়িয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে হয়তো ১৯ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে। তবে প্রয়োজনের সবটুকু তেল ভারতে উৎপাদন করা যাচ্ছে না। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতকে ১৬ মিলিয়ন টনের কিছু বেশি অপরিশোধিত তেল ও প্রায় ৭ মিলিয়ন টন অন্যান্য পেট্রোলিয়াম জাতীয় বস্তু আমদানী করতে হয়েছে। এই আমদানী করতে ভারতকে প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় খরচ করতে হয়েছে। প্রতি বছরেই বিদেশ থেকে প্রায় এই পরিমাণ তেল আমদানী করতে হচ্ছে। এই তেল আমদানী করতে এত বেশী টাকা খরচ হয় যে, দেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে খরচ কমাতে হচ্ছে। তাই আমাদের দেশে তেল-সন্ধানের ওপর আরো জোর দিতে হবে। অয়েল ও ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন তেলের সন্ধানে ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় খননকার্য চালাচ্ছে।'

ক্লাসের আর এক ছাত্র টিটো দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, আপনি এদেশের বিদ্যুৎ-উৎপাদন সম্বন্ধে তো কিছুই বললেন না।'

মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন, 'আমাদের দেশে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিস্থিতি খুব ভাল নয়; বিশেষত পূর্বভারতের পশ্চিমবাংলা ও

বিহারে গুরুতর বিদ্যুৎ-সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে মাত্র ৪০,০০০ মেগাওয়েটের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। ২০০০ সালের পর বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ১,১০,০০০ মেগাওয়েটে। তাই আমাদের বিভিন্ন উপায়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টা হাতে নিতে হবে। কয়লা (থার্মেল) ও জল থেকে (হাইড্রো-ইলেকট্রিক) বিদ্যুৎ সমান অনুপাতে উৎপাদন করলে ভাল হয়। আমাদের পশ্চিম বাংলায় টিটাগড়ে একটি নতুন তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রায় ২০০ মেগাওয়েট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। আর ফরাক্কাতে বিশাল এক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। সেখানে প্রথমে ৬০০ মেগাওয়েট বিদ্যুৎ-উৎপাদন হওয়ার কথা এবং পরে তার পরিমাণ ক্রমশ আরো বেড়ে যাবে। দামোদর ভেলী করপোরেশনও বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ক্ষমতা আরো ১০০০ মেগাওয়েট বাড়াবার প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। সেই জন্যে বাংলা-বিহার সীমানায় আর একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হওয়ার কথা। পশ্চিমবাংলায় যে-সব বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র এখন আছে, সেখানেও উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা চলছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদন না-বাড়াতে পারলে পশ্চিমবাংলায় নতুন কোনো শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা কম। যে-সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারখানা এখানে আছে, বিদ্যুৎ-সঙ্কটের জন্যে তাদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে।'

ছেলেরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই অশ্বিনীবাবু আবার বললেন, 'এটা তোমরা জানো কি আণবিক রিয়েকটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করা যায়? এই আণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা আজ পৃথিবীর বহু দেশেই চলছে।'

ছাত্ররা সমস্বরে বলে উঠল, 'এই সম্বন্ধে কিছু বলুন, স্যার।'

ছেলেদের উৎসাহ দেখে অশ্বিনীবাবুরও বোঝাবার ইচ্ছে বেড়ে গেল, 'আমাদের দেশে বোম্বের কাছে তারাপুরে প্রথম আণবিক শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন হয়। তারপর তামিলনাড়ুর কলাপাক্কামে, রাজস্থানের কোটায় ও নরোরাতে আরো তিনটি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন

করা হয়। তবে তারাপুর আণবিক কেন্দ্র স্থাপনের পর আমাদের দেশে আণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ-উৎপাদন ৪২০ মেগাওয়েট থেকে বেড়ে মাত্র ৬৪০ মেগাওয়েটে দাঁড়িয়েছে। তবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশে আরো ছয়টি ২৩৫ মেগাওয়েট ক্ষমতা বিশিষ্ট আণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করার কথা। এছাড়া আণবিক শক্তি কমিশন প্রোগ্রাম নিয়েছেন যে, আগামী ২০ বছরে আমাদের দেশে প্রথমে ১০টি ও পরে আরো ১২টি ৫০০ মেগাওয়েট বিশিষ্ট আণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। সারা পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন, আরো ২০ বছর বাদে পৃথিবীর অনেক পেট্রোলিয়াম খনিই শুঁকিয়ে যাবে এবং ক্রমশ পৃথিবীতে তেলের সংকট দেখা দেবে। তাই পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই আণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, আমেরিকা ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশ আণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন বাড়াবার পোগ্রাম হাতে নিয়েছে। এমন কি, ছোট্ট দেশ লিবিয়া ওদের দেশে আণবিক শক্তি-উৎপাদনের জন্যে আমাদের দেশের সাহায্য চেয়েছে। আর একটা কথা বলা দরকার। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায় এবং এই দুই ধাতু থেকেই আণবিক শক্তি-উৎপাদন করা হয়। শুধু তারাপুরে এনরিচড্ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় যেটা বিদেশ থেকে আমাদের আমদানী করতে হয়।'

জয়দীপ আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের দেশে আর কোনো ভাবে শক্তি-উৎপাদন করা হয় কি?'

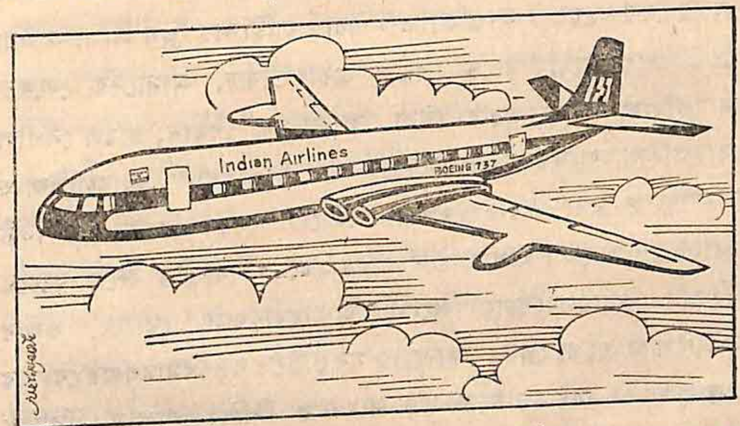
মাস্টারমশাই, ঘড়ি দেখে নিয়ে, সংক্ষেপে বললেন, 'জন্তু-জানোয়ার ও গাছ-গাছড়ার উচ্ছিষ্ট থেকেও শক্তি উৎপাদন করা হয়। এছাড়া গোবর-গ্যাস তৈরির নানান রকম পদ্ধতি সৃষ্টি হচ্ছে, যা রান্নার কাজে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আরো বিভিন্ন উপায়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করার বিষয়ে তোমাদের আগেই জানিয়েছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এই সব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।'

শেষ করার আগে মাস্টারমশাই বললেন, 'একটা সহজ কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির সমৃদ্ধি আনতে আরো শক্তি-উৎপাদনের প্রয়োজন ; তার জন্যে সরকারও ইদানীং যথেষ্ট সচেষ্ট।

চারটে হতে-না-হতে স্কুলে ছুটির ঘন্টা বেজে উঠল। এমন সময় হঠাৎ ক্লাসে বাতি জ্বলে উঠল ও পাখা ঘুরতে লাগল।

উড়োজাহাজ

দমদম বিমানবন্দর। ভোর সাড়ে ছটা। এরই মধ্যে চারিদিকে ভীষণ ব্যস্ততা। কয়েকটা বোয়িং আর ফকার ফ্রেণ্ডশিপ কিছু আগে আকাশে উড়ে গিয়েছে। বিরাট একখানা এরোপ্লেন খোশ মেজাজে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে। সিকউরিটি চেক-আপের পরে ডিপারচার লাউন্স হয়ে যাত্রীরা বাসে করে প্লেনের গায়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। একটু একটু করে প্লেনের টার্বোজেট ইঞ্জিন গর্জে



উঠল। সিঁড়ি সরিয়ে নেবার পর এয়ারহোস্টেজ প্লেনের দরজা লাগাল, পাইলট এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছ থেকে প্লেন রানওয়েতে নিয়ে যাওয়ার ও টেক-আপের সঙ্কেত পেল। সুরেলা গলায় ভেসে এল এয়ারহোস্টেজের ঘোষণা: 'গুডমর্নিং; লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেল-ম্যান, ওয়েলকাম এবোর্ড আওয়ার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট নাম্বার আই. সি. ২৬৩ টু দেল্লি। দি কম্যাণ্ডার অফ দি ফ্লাইট ইজ ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি। কাইণ্ডলি ফ্যাসেন ইওর সীট ব্যাল্টস এণ্ড প্লিজ ডু নট স্মোক...।' আর একজন এয়ারহোস্টেজ প্যাসেঞ্জারদের কাছে ট্রেতে করে চকোলেট, কানে দেওয়ার তুলো ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে এল। ততক্ষণে প্লেন রানওয়েতে লম্বা দৌড় সেরে হঠাৎ এক

ঝাঁকুনি দিয়ে আকাশে উঠে গেল।

প্লেনটার নাম এয়ারবাস ৩০০ বি২। প্লেনে ২৭৮ জন প্যাসেঞ্জারের বসবার সীট আছে। পাইলট ছাড়া এতে আরো রয়েছে ৫।৬ জন কর্মচারী অর্থাৎ কো-পাইলট, ইঞ্জিনীয়ার, এয়ারহোস্টেজ ইত্যাদি। প্রায় ৬০০ মাইল বেগে টারবো জেট ইঞ্জিনবিশিষ্ট এই প্লেনের কলকাতা থেকে দিল্লি যেতে সময় লাগে ২ ঘন্টা, আর বোম্বে ও মাদ্রাজ যেতে যথাক্রমে ২ ঘন্টা ২০ মিনিট ও প্রায় ২ ঘন্টা। এমনি প্রায় ৩০টির মতো ফ্লাইট প্রতিদিন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দেশের নানা স্থানে যাওয়া-আসা করছে। এছাড়া এই বিমানবন্দর দিয়ে সপ্তাহে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক এয়ার লাইন্সের প্লেন আসা-যাওয়া করে। তার মধ্যে আছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, আমাদের দেশের এয়ারইণ্ডিয়া, থাই এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ বিমান, রয়েল নেপাল এয়ারলাইন্স, রাশিয়ার এরোফ্লোট, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্স ও ইউনাইটেড বর্মা এয়ারওয়েজ। আমাদের দেশে এমনি প্রায় ৭০টি বিমানবন্দর আছে। এবং দিনে প্রায় ২০,০০০ যাত্রীর জন্যে রয়েছে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অনেকগুলি এয়ারবাস, বোয়িং, ফকার ফ্রেণ্ডশিপ ও এভ্রো প্লেন। ভারতের সব চাইতে বড় বিমানবন্দর বোম্বের সান্তাক্রুজ ও সব চাইতে বড় রানওয়ে দিল্লির পালাম। বিভিন্ন প্রদেশে ছোট ছোট শহরে যাতায়াতের জন্যে 'বায়ুদূত' নামে নতুন সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। ২০ জন যাত্রী বিশিষ্ট ছোট প্লেন এই সব পথে চলাচল করে।

আশ্চর্য, প্লেনটা আকাশে পাখির মতো শরীর ভাসিয়ে এত দ্রুত গতিতে কী করে ছুটছে! প্লেনটাকে এই শক্তি যোগানোর উৎস যে-টারবো জেট এঞ্জিন, তার চলার পদ্ধতি সম্পর্কে সহজে কিছু বলছি। কমপ্রেসারের সাহায্যে ইঞ্জিনের সামনের দিকে টেনে আনা বাতাসের চাপ বাড়িয়ে তাকে প্রথমে কমবসান চেম্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এবং সেই সঙ্গে পেট্রোল জাতীয় তেল ঢুকিয়ে তেল ও বাতাসের এক জ্বলন্ত মিশ্রণ তৈরি করা হয়—যা অনবরত জ্বলতে

থাকে। এতে যে-গ্যাসের সৃষ্টি হয় তাকে কমবসান চেম্বারের পিছন দিকে খুব বেশি চেপে দিয়ে টারবাইনের ভিতরপথে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়। গরম গ্যাস থেকে পাওয়া এই শক্তি টারবাইন টেনে নিয়ে কমপ্রেসারকে ঘোরায়। ওই গ্যাস বেশ তোড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ইঞ্জিন প্লেনকে সামনের দিকে দ্রুত গতিতে ঠেলে নিয়ে যায়। একটা বেলুনে প্রচুর পরিমাণে বাতাস ঢুকিয়ে হঠাৎ তার মুখটা খুলে দিলে যা হয়, এই প্রক্রিয়া ঠিক তেমনি আর কী।

আগেই বলেছি যে এয়ারবাস এ ৩০০ বি ২ ছাড়াও ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আরো তিন রকমের প্লেন আছে—বোয়িং ৭৩৭, ফকার ফ্রেণ্ডশিপ এফ ২৭ ও এভ্রো এইচ এস ৭৪৮। বোয়িং ৭৩৭ চলে টারবো জেট ইঞ্জিনে। প্যাসেঞ্জারের জন্যে এতে ১২৬টি বসার আসন আছে। ফকার ফ্রেণ্ডশিপ ও এভ্রোতে আছে যথাক্রমে ৪০টি ও ৪৫টি। এই প্লেন দুটি কিন্তু টারবো প্রপেলারে চলে। কমবসান ইঞ্জিনে তেল ও বাতাসের মিশ্রণে যে-তাপের সৃষ্টি হয়, সেই শক্তিতে টারবাইন ঘুরতে থাকে। এবং সঙ্গে তা প্রপেলারকেও চালিত করে। যার ফলে প্লেন সামনের দিকে জোরে এগিয়ে যায়।

তোমরা অনেকে হয়তো জান, এই এরোপ্লেন প্রথম চালিয়ে ছিলেন অরিভিল রাইট নামে এক বৈজ্ঞানিক। তাঁর ভাই উইলবার রাইটকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের হাতে তৈরি চার সিলিণ্ডার বিশিষ্ট একটি প্লেন আমেরিকার কিটি হক-এ বারো সেকেণ্ড চালিয়ে ১২০ ফুট পথ গিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্লেনের প্রযুক্তিবিদ্যা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ বিস্ময়কর উৎকর্ষতায় এসে পৌঁছেছে।

বিশ্বের অনেক দেশেরই বর্তমানে নিজস্ব আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স আছে। আমাদের দেশে এমনি আন্তর্জাতিক বিমান-সংস্থার নাম এয়ার ইণ্ডিয়া। ভারতের প্রধান শহর দিল্লি, বোম্বে, কলকাতা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এয়ার ইণ্ডিয়ার বহু প্লেন প্রতিদিন যাতায়াত করছে। এই সব আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা পৃথিবীকে যেন অনেক ছোট করে ফেলেছে। পৃথিবীর এক শহর থেকে আর এক শহরের

দূরত্ব এখন আমরা অনায়াসে প্লেনের সাহায্যে কত তাড়াতাড়ি পাড়ি দিচ্ছি। ষোড়শ শতাব্দীতে ফার্ডিনেণ্ড ম্যাগেলেন সদলবলে ১০৮১ দিনে সমুদ্রপথে পৃথিবী পরিক্রমা করেন। আর আজ যে-কোনো আন্তর্জাতিক বিমান-সংস্থার টিকিট কেটে সারা পৃথিবী প্রায় তিন দিনেই ঘুরে আসা যায়!

বৃটিশ এয়ারওয়েজ সর্বপ্রথম তাদের আন্তর্জাতিক বিমান-সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর চারিদিকে প্লেন চালাতে শুরু করে। এ-সব প্লেন টারবো জেট, না-হয় টারবো প্রপ জাতীয়। ১৯৫২ সালে প্রথম যে টারবো জেট প্লেন উড়েছিল তার নাম গু হাভিল্যাণ্ড কমেট। কিন্তু তার নির্মাণে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকায় দুটো দুঃখজনক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। যার ফলে এই প্লেন চালানো বন্ধ করতে হয়। তারপর ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত কমেট-৪ নামে আরো এক উন্নততর বিমান ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ব্যবহার করে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে আমেরিকায় বোয়িং ৭০৭ ও ভিসি ৮, ইংল্যাণ্ডে ভিসি ১০ এবং রাশিয়ায় ইল্যুইসিন ২-৬২ ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হল। চার ইঞ্জিন বিশিষ্ট এই সব প্লেন প্রায় একই ধরনে তৈরি। বোয়িং ৭০৭ ও ভিসি ৮-এর ইঞ্জিন ডানার নিচে লাগান থাকে; ভিসি ১০ বা ইল্যুইসিন ২৬২ প্লেনের ভিতর আওয়াজ কমাতে তা পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্রমশ বিমানবন্দরে দেখা দিল উন্নততর ট্রাইডেন্ট ৩, ট্রাইস্টার, কনকর্ড, সুপার ৭৩৭ ইত্যাদি। এল বোয়িং ৭৪৭, যা জাম্বো জেট নামে খ্যাত।

লম্বায় ৭০ মিটার ও ওজনে ৩২০ টনেরও অধিক এই প্লেনে প্রায় ৩৫০ জন যাত্রী বসতে পারে। এবং ঘন্টায় তার গতিবেগ প্রায় ৯৭০ কিলোমিটার। ফ্লাইট ডেকের (অর্থাৎ যেখানে বসে পাইলট প্লেন চালায়) ঠিক পিছনে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বসার জায়গা ও তার পিছনে আছে ইকনমি ক্লাস। কলকাতা থেকে ব্রিটিশ এয়ার-ওয়েজের জাম্বো জেটে করে লণ্ডন যেতে সময় লাগে প্রায় ১৬ ঘন্টা—মাঝে মধ্যপ্রাচ্যের শহর মাসকট ও ইতালির রোমে শুধু দু'বার আধ ঘন্টার জন্যে জ্বালানী নিতে নামে। এত ভাল ডিনার বা ব্রেকফাস্ট

প্লেনে পরিবেশন করে যে তা শুনলে তোমাদের জিভ হয়তো জলে ভরে আসবে। সীটের গায়ে লাগান তিন চ্যানেলের যে-কোনো একটায় প্লাগ ঢুকিয়ে দিয়ে উল্টোদিকটা ডাক্তারি স্টেথোর মতো দুই কানে লাগালে মিষ্টি গান শুনতে পাবে—যতক্ষণ ইচ্ছে এই গান শুনতে পার। তিনটে চ্যানেল দিয়ে তিন রকম গান পরিবেশিত হয়। রাত্রিতে আবার প্লেনের ভিতর একটা ইংরেজি ভাল 'মুভি' দেখায়—সেই স্টেথিসস্কোপ জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু সব কথা শুনতে হবে। এর উদ্দেশ্য হল যারা বিশ্রাম নিতে চায় তারা এ-সব কোনো আওয়াজই পাবে না।

প্লেনে আবার অনেক অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে। এই তো কিছুদিন আগে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি প্লেন যখন পাকিস্তান থেকে লণ্ডন যাচ্ছিল, তখন তাতে একজন যাত্রী গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে; পরে আমান শহরে নেমে হাসপাতাল যাওয়ার পথে মারা যায়। আর এক মহিলা সেই প্লেনে এক কন্যাসন্তান প্রসব করে। শুনলে আরো অবাক হবে, সেই প্লেনেই একজন নার্স ও ডাক্তার ছিল, যারা এদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করে।

প্লেনের পাইলটের দায়িত্ব কিন্তু অনেক। তাকে প্রথমেই সম্পূর্ণ পথের আবহাওয়া ভাল করে জানতে হবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা, বায়ুর গতিবেগ, পথে আবহাওয়া পরিবর্তনের আভাস ইত্যাদি বুঝে নিয়ে কখন প্লেন ছাড়বে, কত উঁচু দিয়ে যাবে, কী গতিবেগে যাবে, ক'টায় গিয়ে কোথায় পৌঁছবে, এ সবই তার পরিকল্পনায় রাখতে হয়। তবে উঁচুতে সাধারণত 'জর্জ' (পাইলটরা মজা করে প্লেনকে এই নামে ডাকে) স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলতে থাকে, পাইলটের তখন আবহাওয়া ও গতিপথের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়াটাই জরুরি। ককপিটের (আজকাল ফ্লাইট ডেক নামে প্রচলিত) বাঁ দিকের সীটে পাইলট বসে; কো-পাইলট, যাকে ফার্স্ট অফিসার বলা হয়, বসে তার ডান পাশে। নানারকম যন্ত্রপাতি ও কন্ট্রোল এদের তত্ত্বাবধানে থাকে। প্লেন ওঠা ও নামার সময় পাইলট নিজে তা পরিচালনা করে—অন্য

সময় কো-পাইলটও প্লেন চালায়। প্লেনে আরো দু'জন পদস্থ কর্মচারী থাকে—একজন ইঞ্জিনীয়ার ও একজন দিক-সঙ্কেত জ্ঞানসম্পন্ন অফিসার।

শূন্যে ভাসমান প্লেনের গতিপথ -বিভ্রমে কী টেনশনের মুখোমুখি হতে হয়, তেমন এক ছোট্ট ঘটনা বলছি। আমাদের ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইন্সের একটি প্লেন আগরতলার দিক থেকে কলকাতায় আসছিল। পথে ঝড়োমেঘের মধ্যে পড়ে প্লেনটি ক্রমশ ওপরে উঠতে উঠতে কিছুক্ষণ পর কন্ট্রোলের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন দিশাহারা হয়ে আকাশের এদিক ওদিক চারিদিকে ঘুরতে থাকে আর তার পাইলট নানাদিকে সাহায্যের সংকেত পাঠাতে লাগল। এমন সময় একটি থাই এয়ার লাইন্সের প্লেন সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তার পাইলট এই প্লেনের পাইলটকে সংযোগবার্তায় বলল, 'তুমি বার্মা সীমান্তে চলে এসেছ—আমি অন্যদিকে যাচ্ছি—তবে পেছনে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের আর একটা প্লেন আসছে এবং কলকাতায় যাচ্ছে,আমি তার পাইলটকে বলছি তোমাদের গাইড করে কলকাতায় নিয়ে যেতে।' ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের সেই প্লেনটি এই প্লেনকে গাইড করে কলকাতায় নিয়ে আসে। নামার পর প্লেনে কিন্তু আর সামান্যই জ্বালানী ছিল। চিন্তা কর—আরো কিছু সময় এই প্লেন আকাশে থাকলে কত ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ই না ঘটে যেতে পারত।

শুধু কি এই, অনেক সময় আবার প্লেনের চাকায় কোনো গোল-যোগ দেখা দিলে বেলি ল্যাণ্ডিং বা চাকা ছাড়াই প্লেনকে রানওয়েতে নামতে হয়। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কিন্তু যথেষ্ট। এমন কি, আকাশের চিল বা ও-জাতীয় কোনো উড়ন্ত বড় পাখির সঙ্গে অতর্কিতে ধাক্কা লেগেও প্লেন বিপদের মুখে পড়তে পারে। কয়েক বছর আগে একটি বিদেশী জেট প্লেনের পাইলট রাত্রির অন্ধকারে ভুল বুঝে দমদমের পরিবর্তে ব্যারাকপুরের সামরিক বিমানবন্দরের ছোট রানওয়েতে নেমে যায়—তবে তাতে কোনো বিপদ অবশ্য হয়নি। তার ওপর রয়েছে প্লেন-ছিনতাই। প্লেন-ছিনতাই করার কথা

তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আজকাল প্রায়ই পত্রিকায় দেখতে পাও ছিনতাইকারীরা কোনো দেশের প্লেনকে ছিনতাই করে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। এবং সেই প্লেন ও তার যাত্রীদের বিনিময়ে যে-দেশের প্লেন, বেতারের সাহায্যে, তাদের কাছে কোনো দাবী জানাচ্ছে। গত বছর মার্চ মাসেই তিনজন ছিনতাইকারী একশো জন যাত্রীসহ পাকিস্তানের একটি প্লেন প্রথমে কাবুল ও পরে সিরিয়ার দামাসকাস বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ জন রাজনৈতিক বন্দী ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘ সময় যাবৎ প্লেন ছিনতাইয়ের ইতিহাস রচনা করে তেরো দিন পর ওরা প্লেনের চালক ও যাত্রীদের ছেড়ে দেয়। প্যালেস্তাইন গরিলারা ১৯৬৮ সালে সব চাইতে দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ৩৯ দিন ধরে ইজরায়েলের একটি প্লেন এলজিয়ারাস বিমান-বন্দরে আটকে রেখে প্লেন-ছিনতাইয়ের এক রেকর্ড করে রেখেছে। আমাদের দেশের ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের চারটি প্লেন ইতিমধ্যে ছিনতাই হয়েছে। ১৯৮১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে একশো সতেরোজন যাত্রী-বোঝাই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একখানা বোয়িং ৭৩৭, দিল্লি থেকে অমৃতসর হয়ে শ্রীনগর যাওয়ার পথে, ডালখালসা নামে এক শিখ-সংস্থার পাঁচজন সদস্য, পাইলটকে তরবারি দেখিয়ে, ছিনতাই করে লাহোর নিয়ে যায়। তবে পাকিস্তানের সেনানীরা ঝাড়ুদারের সাজে প্লেনে উঠে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে ফেলে। প্লেন ও যাত্রীরা নিরাপদে ভারতে ফিরে আসে। তাছাড়া একটি ফোকার ফ্রেণ্ডশিপ দিল্লি থেকে শ্রীনগর যাওয়ার পথে লাহোরে, একটি বোয়িং ৭৩৭ দিল্লি থেকে জয়পুর যাওয়ার পথে করাচীতে ও একটি বোয়িং ৭৩৭ লখনউ থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে বারানসীতে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয়। তোমরা জান হয়তো প্লেন-ছিনতাই বন্ধ করার জন্যে আজকাল যাত্রীদের প্লেনে ওঠার আগে সঙ্গের ব্যাগ, ব্রিফকেশ ইত্যাদি তল্লাসি চালিয়ে ও শরীর বাইরে থেকে পরীক্ষা করে দেখা হয়, কোনো মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে

কিনা। অনেক জায়গায় আবার সঙ্গে থাকা ব্যাগ, ব্রিফকেশ ইত্যাদির মধ্যে আলোর রশ্মি চালিয়ে ওপরে রাখা কাঁচের পর্দায় ব্যাগে থাকা জিনিসগুলির ছবি পরীক্ষা করা হয়। তবুও প্লেন-ছিনতাই এখনো সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়নি। তবে সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন যত প্লেন উড়ছে, তার তুলনায় এই জাতীয় ঘটনা খুবই নগণ্য।

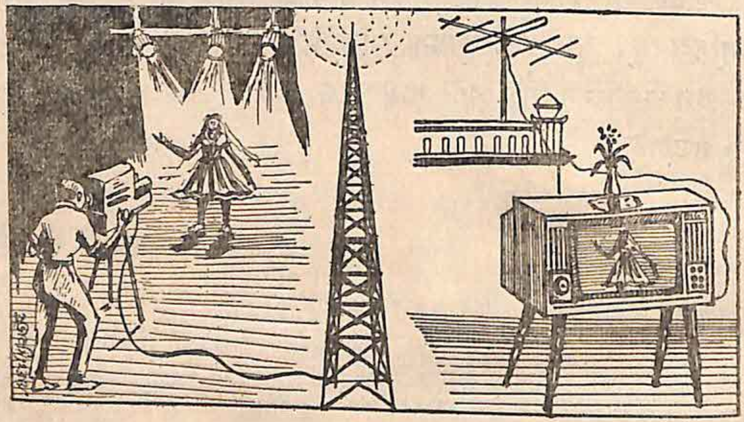
আকাশের কত উঁচুতে পেঁজা তুলোর মতো ভাসমান মেঘের পাশ কাটিয়ে, কখনো নিচের গর্জমান নদী, উত্তাল সমুদ্র, নীল পাহাড়শ্রেণী, সবুজ অরণ্যমালা, সোনালি শস্যখেত বা কোনো ছোট্ট শহরের আদল বা বন্দরের আলোকিত উজ্জ্বলতা দেখে, প্লেনে উড়ে বেড়ানো কী উদ্দীপনাময় আর রোমাঞ্চকর—তাই না? আরো মজা লাগে যখন মাত্র কয়েক ঘণ্টায় প্লেনে করে আমরা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে যাই।

কী হল, বড় হয়ে পাইলট হতে ইচ্ছে করছে? কলকাতার বেহালায় রাজ্যসরকার পরিচালিত ফ্লাইং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্লেন চালানো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে এয়ার উইং-এর ছেলেদের প্রথমে গ্লাইডার চালানো শেখানো হয়, পরে পাওয়ার ফ্লাইং করতে দেওয়া হয়। গ্লাইডার, যা ইঞ্জিনবিহীন এক প্লেন, গাড়ির পেছনে বেঁধে রানওয়ের ওপর দৌড় করিয়ে উড়িয়ে দিলে ঠিক উড়ে চলবে। আকাশে গতিবেগ বাড়ানো বা বাঁক নেওয়ার জন্যে বা নিচে নামার জন্যে সাধারণ প্লেনে যা নিয়ম সেই একই ভাবে ওকে চালাতে হবে। গ্লাইডারকে সব সময় ফোর্স ল্যাণ্ডিং প্রথায় নামতে হয়—এই পদ্ধতিটা এতে খুব ভালো শেখা যায়। এতে জ্বালানীর কোনো খরচ লাগে না। এয়ার উইং বাদ দিলে মাত্র কয়েক-জন শিক্ষার্থী আছে বেহালায়। তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাইং-এর খরচাও প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। কমার্শিয়াল লাইসেন্সের জন্যে বর্তমানে প্রয়োজন দেড়শো ঘণ্টা সোলো ফ্লাইং বা একক ভাবে প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা। এই প্রথায় পাইলট হওয়া খুবই ব্যয়সাপেক্ষ —তাই, যারা পাইলট হতে চাও তাদের এয়ার উইং-এ যোগ দেওয়াই

ভাল। বিনা খরচে সোলো ফ্লাইং শেষ করে এখান থেকেই সরাসরি যাওয়া যায় এয়ারফোর্স-এর সিলেকশান বোর্ডে। এ তো গেল ছেলেদের কথা। যারা মেয়ে, তারাও পাইলট হতে পারো, তবে পাইলটের ঝুঁকি না-নিয়েও কিন্তু বড় হয়ে সহজেই এয়ার হোস্টেজ হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়াতে পারো। আর এয়ার হোস্টেজের মতো সুন্দর করে বলতে পারো: 'লেডিজ এণ্ড জেন্টেলম্যান, মে আই অন বিহাফ অফ ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস, ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী এণ্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য ক্রু বিড ইউ অল গুডবাই। উই হোপ ইউ হ্যাড এ প্লেজেন্ট ফ্লাইট। ফর ইওর ইনফরমেশন, দি আউটসাইড টেম্পরেচার ইজ ৩০ ডিগ্রি সেল্‌সিঅ্যাস্। অল প্যাসেঞ্জারস্ আর রিকোয়েস্টেড টু রিমেন সিটেড আনটিল দ্য ফাসেন সিট বেল্ট সাইন ইজ সুইচড্ অফ। থ্যাঙ্ক ইউ এণ্ড গুডবাই।'

টেলিভিশন

যে-সব শহরে টেলিভিশন বা দূরদর্শন আছে, সেখানকার বা তার আশ-পাশের লোকেরা বাড়িতে বসেই শহরে দেখার মতো যা-কিছু হচ্ছে, তা দেখে নিচ্ছে। টেলিভিশন যেন সমস্ত শহরকে বাড়ির দোর-গোড়ায় এনে দিয়েছে। শুধু কি তাই? বিশাল এই দেশের না-চেনা কত দৃশ্যাবলী, পশুপাখি ও মানুষের কত বিচিত্র জীবনযাপন আমরা টেলিভিশনের পর্দায় প্রায়ই দেখতে পাই। তবে শহরের বাইরের



যে-ছবি আমরা দেখি, তার বেশির ভাগই আগে ক্যামেরায় তুলে, পরে টেলিভিশনের পর্দায় মেলে দেওয়া হয়। বিদেশে কিন্তু অনেক শহরে রিলে অথবা স্যাটেলাইট প্রথায় অন্যান্য শহরের বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে-বিশেষ ঘটনা ঘটছে, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই যেমন ১৯৮১ সালের ২৯ জুলাই লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত সেন্টপলস ক্যাথিড্রেলে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ চার্লসের সঙ্গে লেডি ডায়না স্পেনসারের যে-বিয়ে হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সাত ঘন্টা ধরে সারা পৃথিবীর অন্তত ৫০ লক্ষ লোককে সরাসরি বি বি সি টেলিভিশনে দেখানো হয়েছিল। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজ নয়। এই অনুষ্ঠান দেখাতে বি বি সি টেলিভিশনকে ৬০টি

ক্যামেরা, ১২টি ভ্রাম্যমাণ কন্ট্রোলরুম ও প্রায় ৩০০ লোককে নিয়োগ করতে হয়েছিল। ঠিক একই ভাবে ইউরোপের বা আমেরিকার অনেক বড় শহরে রোববার তো বটেই, অন্যবারেও বিভিন্ন চ্যানেলে নানা রকমের খেলা সরাসরি মাঠ থেকে দেখানো হয়। এমনও দেখা যায় যে, অন্যান্য চ্যানেল ব্যস্ত থাকায় একই চ্যানেল থেকে একই সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খেলার—যেমন ক্রিকেট, অ্যাথেলেটিকস্, মল্লযুদ্ধ, মোটর রেস ইত্যাদির বিশেষ অংশ কন্ট্রোলরুম থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দর্শকদের দেখানো হচ্ছে। এই ভাবে বিভিন্ন খেলার উত্তেজক কিছু কিছু অংশ একই দিনে ঘরে বসে যে দেখা সম্ভব, তা ভাবতে আমাদের আজও অবাক লাগে, তাই না?

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সব চাইতে বড় টেলিভিশন-কেন্দ্র হল লণ্ডনের বি বি সি। রেডিওতে লণ্ডন বি বি সি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস তো আমরা সব সময়েই শুনতে পাই। সেখানকার ৫২টি স্টুডিও থেকে পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে ভারতীয় উর্দু, হিন্দী, বাঙলা, তামিল (সপ্তাহে ৪ দিন) ও নেপালী (সপ্তাহে ৩ দিন) ভাষাও আছে। কিন্তু বি বি সি টেলিভিশনের ঐ অত্যাশ্চর্য অনুষ্ঠানগুলো দেখতে হলে আমাদের তো যেতে হবে সেই লণ্ডন।

লণ্ডন টেলিভিশনের বি বি সি ১ বি বি সি ২ ইত্যাদি চ্যানেল-গুলো অনেকটা কলকাতা আকাশবাণীর ক ও খ-এর মতো অর্থাৎ চ্যানেল ঘোরালেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখা যায়। লণ্ডনের শেপার্ড বুশের বিরাট ৮টি স্টুডিও দ্বারা নির্মিত টেলিভিশন-কেন্দ্র থেকে এই অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। টেলিভিশনের বাৎসরিক লাইসেন্স ফি বাবদ সাধারণ লোকের কাছ থেকে যে-টাকা আদায় হয়, তাতেই এদের সব খরচ চলে যায়। টেলিভিশনের অন্য চ্যানেল আই টি ভি-তে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। বিরাট স্টুডিও ছাড়া বি বি সি টেলিভিশনে সাজসজ্জার ঘর, প্রসাধনের ঘর কলা-শিল্পের ঘর প্রভৃতি দেখার মতো।

ছোটদের জন্য বি বি সি টেলিভিশন এত সুন্দর ও মজাদার

অনুষ্ঠান করে যে, তা না-দেখলে বোঝা যায় না। দুপুর বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বি বি সি টেলিভিশনের অনুষ্ঠান প্রচারের যে-সময় ধার্য করা আছে, তার মধ্যে দুপুর ও বিকেলের দিকে ছোটদের বহু অনুষ্ঠান দেখানো হয়। যেমন অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় ফিল্ম, আজব বৈজ্ঞানিক ফ্যান্টাসি, কৌতুকরচনা (যেমন লণ্ডন বাসে লেডি কণ্ডাক্টর কী করে টিকিট বিক্রি করে), মূকাভিনয়—আরো কত কী দেখানো হয়! ক্রিকেট, টেনিস, ঘোড়দৌড়, মল্লযুদ্ধ এমন নানা ধরনের খেলাধুলোও এর মধ্যে থাকে। লণ্ডনে ফুটবলের মান খুব উঁচু। ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম বা অন্য কোথাও তেমন কোনো ফুটবল খেলা হলে, তাও টেলিভিশনে দেখানো হয়। কর্ণার কিক থেকে বল বেঁকে গোলে ঢুকে যাওয়া, দুরূহ কোণ থেকে হেড করে গোল দেওয়া, বহুদূর থেকে কোণাকুণি তীব্র সটে গোল দেওয়া বা পেনালটি সট গোলকীপারের বাঁচিয়ে দেওয়া—এ-সব প্রায়ই টেলিভিশনে দেখানো হয়। স্লো মোশনে দেখানো হয় বলে আরও ভাল লাগে।

কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে তোমরা নিশ্চয়ই 'ফাদার, ডিয়ার ফাদার, 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ারল্ড ইন এইট-টি ডেজ', 'দি অ্যাসেন্ট অফ ম্যান', সেক্সপীয়রের নাটক ইত্যাদি দেখেছো—এ সবই বি বি সি টেলিভিশনের তৈরি অনুষ্ঠান। এ-ছাড়া টেলিভিশনে প্রতিদিন দুপুরে নির্দিষ্ট সময়ে নানান শিক্ষামূলক বিষয়—যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কিত অনুষ্ঠান পরিবেশন করে স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা হয়। ক্লাসে বিষয়টি কেউ ভাল রকম না-বুঝলেও টেলিভিশনের পর্দায় ছবির মাধ্যমে বিষয়টি সহজ হয়ে ওঠে। আমরা জানি, যে-কোনো ছবির মনের উপর রেখাপাত করার ক্ষমতা অপরিসীম। তোমরা যারা কলকাতা দূরদর্শনেছোটদের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে ভালোবাস,তারা প্রায় দিনই সন্ধ্যেবেলা পড়াশুনোর জন্য হয়তো তা ঠিক মতো দেখতে পার না। কিন্তু ওখানকার ছেলেমেয়েদের সন্ধ্যেবেলা পড়াশুনোর কথা ভেবেই দুপুরে ও বিকেলে অনুষ্ঠানগুলো দেখানো হয় তাদের। আর ঠিক

সাতটা-আটটার সময় বড়দের জন্য নানা অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সে-সমস্ত অনুষ্ঠানের খবরাখবর তোমাদের শুনতে ভালো না-ও লাগতে পারে। তবে এটুকু জানা প্রয়োজন যে, বি বি সি টেলিভিশন রোববার সকালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শ্রোতাদের জন্য আধ ঘণ্টা এক বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, বি বি সি টেলিভিশনের সংবাদ পরিবেশনের ধরনটি সত্যিই চোখে লেগে থাকে। লণ্ডনের কাছে কোনো শহরে বা অনেক সময় অন্য দেশে—যেমন ফ্রান্স বা পশ্চিম জার্মানীতে—সকালে ঘটা কোনো ঘটনার ছবি সেদিন বিকেলেই বি বি সি টেলিভিশনের খবরে পরিবেশন করা হয়। আমাদের দেশের নানান জায়গায় উৎসব বা কোনো বিপর্যয়ের ঘটনা হয়তো কলকাতা টেলিভিশনে সেদিনই দেখানো সম্ভব হয় না, অথচ বি বি সি টেলিভিশনের প্রতিনিধিরা কিন্তু যেদিনের ঘটনা সেদিনই ক্যামেরায় ধরে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, বিকেলের খবরে দেওয়ার জন্য।

ইউরোপের সব দেশেই এত শীত যে, লোকে বাড়িতে বসে অজস্র রকমের অনুষ্ঠান ও সংবাদে-ভরা টেলিভিশনের সামনে থেকে আর নড়ে না। শুনলে অবাক হবে, পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর (আমাদের রাষ্ট্রপতির সমতুল্য) কিছুদিন আগে দেশবাসীকে সপ্তাহে একদিন টেলিভিশন বন্ধ রেখে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড বলো আর ইউরোপের অন্য কোনো দেশের কথাই বলো, সব জায়গাতেই কিন্তু রাত বারোটা পর্যন্ত টেলিভিশনের বিচিত্র অনুষ্ঠানগুলো দেখে ভোরবেলা ঠিক সময়ে কাজে যাওয়াই প্রায় মুশকিল হয়ে পড়ে।

এতক্ষণ তো বিদেশের কথা হল। এবার একটু দেশের কথায় আসা যাক। নিজের দেশের কথা না-জানলে তো অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে ভালোমন্দ বিচার করা যায় না। কলকাতা দূরদর্শন-কেন্দ্রের অনেক অনুষ্ঠানই—বিশেষত ছোটদের অনুষ্ঠানগুলো বেশ ভাল। যেমন 'চিচিং ফাঁক', 'হরে কর কম্বা', 'মাইকেলের আসর',

'জানা অজানা'—তোমাদের পরিবেশিত এসব অনুষ্ঠান আমাদেরও বেশ ভালো লাগে। তবে কলকাতা দূরদর্শনের দৈনিক সামান্য অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে তোমাদের জন্য হয়তো আর বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হয় না।

কলকাতা ছাড়াও এদেশে দূরদর্শন-কেন্দ্র রয়েছে দিল্লি, শ্রীনগর, লখনৌ, বম্বে, পুনা, মাদ্রাজ, সম্বলপুর, জয়পুর, মজঃফরপুর, রায়পুর, আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দাম ইত্যাদি শহরে। কিছু দূরদর্শন-কেন্দ্রে দিল্লি থেকে সরাসরি প্রোগ্রাম দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ক্রমশ জাতীয় চ্যানেলে দিল্লির প্রোগ্রাম ও অন্য চ্যানেলে স্থানীয় প্রোগ্রাম দেখালে দূরদর্শন কেন্দ্রের আকর্ষণ আরও বাড়বে। পশ্চিম-বঙ্গে শুধুমাত্র কলকাতায়ই দূরদর্শন-কেন্দ্র আছে। আসানসোল-দুর্গাপুর,মুর্শিদাবাদ-মালদহ,শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ইত্যাদি এলাকায়ও দূরদর্শনকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। দু-একটা জায়গায় কলকাতা দূরদর্শনের 'রিলে সেন্টার' বসানো যায়। দূরদর্শন কেন্দ্রে একটা বিশেষ সময়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে শিক্ষা-বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করলে কি খুব ভাল হয় না?

এতক্ষণ দেশবিদেশের টি ভি সম্পর্কে তো বললাম। কিন্তু কী করে এত সব ঘটনা বা অনুষ্ঠান দূরদর্শন-কেন্দ্র থেকে বাড়ির টেলিভিশনের পর্দায় আসে সেটা কখনো ভেবে দেখেছো কি?

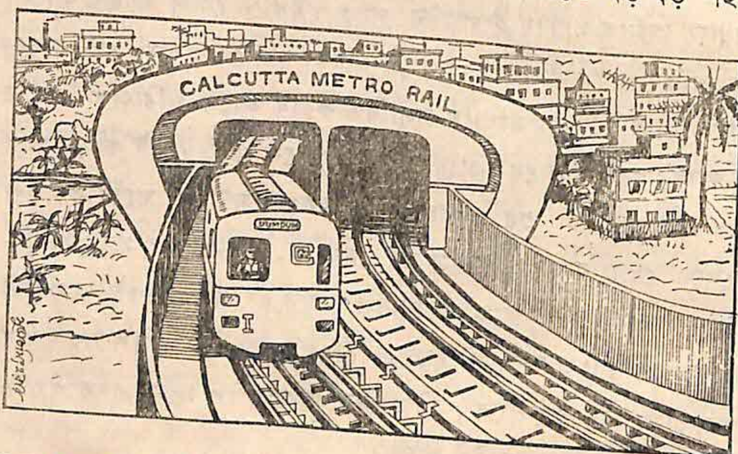
বেয়ার্ড নামে এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টেলিভিশনের আবিষ্কর্তা। টেলিভিশনে প্রচারিত যে-অনুষ্ঠান, প্রেরকযন্ত্র বা ট্রান্সমিটার চারদিকে প্রেরণ করে, বাড়িতে রাখা টেলিভিশন সেট তাকে এরিয়াল বা অ্যান্টেনার সাহায্যে গ্রহণ করে। অভ্রনির্মিত পাতলা গোল প্লেট দিয়ে প্রেরকযন্ত্রে এক মোজায়েক পর্দা তৈরি করা হয়। প্লেটের এক পিঠে খুবই ছোট হাজার-হাজার রূপোর দানা গাঁথা থাকে এবং তার উপর সেলেনিয়াম ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। এখন এই সেলেনিয়াম ধাতুর উপর আলোক রশ্মি ফেললে তা থেকে আরও বেশি মাত্রায় ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়। টাংস্টেন বা প্লাটিনাম

ফিলামেন্ট দিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তা উত্তপ্ত হয়, যার ফলে ইলেকট্রন ধাতু থেকে ছিটকে বেরোয়। এই ইলেকট্রন প্রক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে একত্র হয়ে পাতলা ও ঘন রেখার আকারে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং ক্রমশ এক বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে ইলেকট্রন প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার বার ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে দুলতে থাকে। ট্রান্সমিটার এই ইলেকট্রনকে বাইরে সঞ্চারিত হওয়ার জন্য প্রেরণ করে এবং অ্যানটেনা এই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গমালাকে ধরে টেলিভিশন সেটে পাঠায়। পর্দার গায়ে যেখানে অধিক মাত্রায় ইলেকট্রন পড়ে সেখানে বেশি মাত্রায় আলো হয়, আর যেখানে কম পড়ে সেখানে আবছা ছবি দেখা যায়। যে-কোনো দৃশ্যকে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রসারিত করার আগে পরিলেখন করার প্রয়োজন হয়, ফলে যে-কোনো মাপের দৃশ্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে প্রেরণ করা হয়, অথচ টেলিভিশনে সেটাকে স্বাভাবিক দৃশ্য হিসেবে দেখা যায়। গদার মতো দেখতে ইকনোসকপ যন্ত্র দূরদর্শন-কেন্দ্রে প্রচারিত দৃশ্যকে সঞ্চারিত করে। এই একই প্রকৃতির কিনোসকপ গ্রাহক যন্ত্র সেই দৃশ্যকে গ্রহণ করে টেলিভিশনের পর্দার গায়ে তাকে ফুটিয়ে তোলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এসব পদ্ধতি ক্রমে আরও উন্নত ও জটিল হচ্ছে।

পাশ্চাত্যের সব দেশেই কিন্তু রঙীন টেলিভিশন চলে—এতে অনুষ্ঠান আরও রমণীয় হয়। তবে সস্তা দামের টেলিভিশনও সেখানে প্রচুর তৈরি হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে টেলিভিশন সেট কেনা তাই খুবই সহজ। আমাদের দেশেও রঙীন টেলিভিশন চালু করা হয়েছে। তবে এ-ব্যাপারে একটা কথা আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে—কেমন করে আরও সস্তা দামের টেলিভিশন তৈরি করা যায়, যাতে করে ঘরে-ঘরে রেডিওর মতো টেলিভিশন লোকে দেখতে পারে।

পাতাল-রেল

কলকাতায় পাতাল-রেল চলতে আর বেশি দেরি নেই। আজ থেকে একশো বছর আগে কলকাতার প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলা শুরু হয়েছিল। এরপর ১৯০২ সালে এল ইলেকট্রিক ট্রাম। অল্পদিন বাদে ১৯০৯ সালে ট্যাক্সি আর ১৯১২ সালে বাস। কলকাতার বুক কাঁপিয়ে ডবল-ডেকার যাত্রা শুরু করেছিল ১৯২৬ সালে। বাণিজ্যিক লেনদেনে ও অসংখ্য কলকারখানার অফিস-কাছারিতে বড় বড় শহর-



গুলো আজ বোঝাই।

কলকাতার জনসংখ্যা আজ এত বেড়ে গেছে যে, এখন কলকাতায় পাতাল-রেলের প্রয়োজনীয়তা সকলে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। পৃথিবীর অন্যতম দুই বিখ্যাত শহর লণ্ডন ও প্যারিসে পাতাল-রেলপথ একশো বছরেরও আগে বসান শুরু হয়েছে। এবং সেখানকার যানবাহনের সমস্যা এই পাতাল-রেলপথের প্রসারে আজও তেমন শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে ওঠেনি।

কলকাতায় দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ১৬.৪৩ কিলো মিটার দূরত্বে পাতাল-রেল তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে দমদমে ১.৫ কিলো মিটার দূরত্ব এবং টালিগঞ্জে সামান্য দূরত্ব ট্রেন মাটির উপরে চলবে আর বাকি

অংশে মাটির নীচে। প্রথমে ভিড়ের সময়ে এসপ্ল্যানেড-টালিগঞ্জ অংশে কুড়িটির মতো ও দমদম-শ্যামবাজার অংশেও কিছু সংখ্যক গাড়ি চলার কথা। ক্রমশ দমদম থেকে টালিগঞ্জে আঠাশটি গাড়ি চালানোর পরিকল্পনা আছে। রাস্তায় ১৭টি স্টেশন থাকবে—সেগুলি হল দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজর, গিরীশ পার্ক, মহাত্মা গান্ধী রোড, মধ্যকলকাতা, চাঁদনি চক, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রীট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর, যতীনদাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র-সরোবর এবং টালিগঞ্জ। দমদম থেকে টালিগঞ্জ যেতে লাগবে ৩৩, দমদম থেকে এসপ্ল্যানেড ১৮ এবং এসপ্ল্যানেড থেকে টালিগঞ্জ ১৫ মিনিট। প্রতি স্টেশনে ট্রেন থামবে ৩০ সেকেণ্ড (আধ মিনিট)। প্রতি ট্রেনে ৮টা করে কামরা থাকবে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত চলবে ট্রেন। পাতাল-রেলের সর্বোচ্চ গতি হবে ঘন্টায় ৮০ কি. মি. তবে গড়ে ঘন্টায় ৩০ কি. মি. গতিতে চলবে।

লণ্ডন ও প্যারিস শহরে যেন এই পাতাল-রেলের জাল বোনা আছে। শহরের যে-কোন অংশ থেকে অন্য অংশে পাতাল-রেলে যাওয়া যায়। তার জন্য কোথাও এক ট্রেন থেকে নেমে অন্য ট্রেনে উঠতে হতে পারে। লণ্ডন শহরে পাতাল-রেল টেমস নদীর নীচে দিয়ে দক্ষিণ দিকেও প্রসারিত হয়েছে। প্যারিসেও ট্রেন মাটির উপর উঠে সেইন নদীর ওপরকার পুল পেরিয়ে আবার পাতালে চলে গিয়েছে। লণ্ডনে পাতাল-রেল বহু কি. মি. দূরত্বের মধ্যে চলাচল করে, আর এই রাস্তার মধ্যে ২৪৯টা স্টেশন আছে। তবে এ-কথা বলা দরকার যে, এই দুই শহরেই প্রথমে কলকাতার মতোই অল্প অল্প করে পাতাল-রেল বসান হয়েছিল। এবং একশো বছরের উপর ধরে ক্রমশ গোটা শহরে পাতাল-রেল ছড়িয়ে গিয়েছে।

কলকাতা শহরে ধীরে ধীরে পাতাল-রেলকে আরও নানা জায়গায় ছড়ানো যেতে পারে, যদিও ব্যাপারটা বিশাল খরচের আর সময়ও লাগবে প্রচুর, মাত্র কয়েক বছর আগে লণ্ডন শহর থেকে হিথরো বিমান-বন্দর পর্যন্ত নতুন পাতাল-রেল চালু করা হল। ইউরোপের এই দুই

শহরে পাতাল-রেল কিন্তু সম্পূর্ণ 'কাট অ্যাণ্ড কভার' (মাটি খুঁড়ে লাইন বসিয়ে আবার ঢেকে দেওয়া) প্রণালীতে বসান হয়নি, অনেক জায়গায় টিউব প্রণালীতেও (অর্থাৎ মাটির নীচে রাস্তা) তৈরি করা হয়েছে। কলকাতায়ও বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজারের ০.৮ কি. মি. অংশে সুড়ঙ্গ প্রণালীতে মাটি খুঁড়ে পাতাল-রেল বসানোর কথা।

কলকাতায় পাতাল-রেল চালানোর জন্য প্রয়োজন ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। যোগান দেবে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন। লণ্ডন ও প্যারিস শহরে কিন্তু পাতাল-রেল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র আছে। যেমন, লণ্ডনের চেলসী ও গ্রীনিচে স্থাপিত হয়েছে পাতাল-রেলের নিজস্ব বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্র। সেখান থেকে ২৯৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাতাল-রেলের জন্য যোগান দেওয়া হয়। তবে লণ্ডনের ইলেকট্রিসিটি বোর্ডও কিছু কিছু বিদ্যুৎ পাতাল-রেলকে সরবরাহ করে—যার সাহায্যে মাটির ওপরের অংশে ট্রেন চলে।

কলকাতার স্টেশনগুলো হবে কোথাও একতলা আবার কোথাও দোতলা। তবে মাটির ওপর থেকে কোনো স্টেশনই নয় মিটারের বেশি নিচু হবে না। বিদেশে অনেক শহরে একই স্টেশনে নানান স্তরে পাতাল-রেল বসান আছে এবং অনেক স্টেশন মাটি থেকে বহু নীচে অবস্থিত। স্টেশনে যাওয়া-আসার জন্য অধিকাংশ জায়গায়ই এসকালেটর আছে। কিছু কিছু স্টেশনে বড় লিফটও আছে। কলকাতায় আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে।

পাতাল-রেল যখন চলে তখন প্রতিটি কামরার সব দরজা বন্ধ রাখতে হয়—না-হলে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। প্রতিটি স্টেশনে যাত্রীরা নিজের থেকে দরজা খুলে নামতে পারবে কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগে প্রতিটি কামরার দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। গার্ড বা ট্রেন-চালকের কামরার সব দরজা বন্ধ হওয়ার নির্দেশক আলো না-জ্বললে ট্রেন আবার চলতে শুরু করবে না। লণ্ডন ও প্যারিসে আজকাল কিছু সংখ্যক ট্রেনে এমন পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছে যে, আলো না-জ্বাললে ট্রেনই চলবে না। পাতাল-রেলের সব স্টেশনে ও

সমস্ত সুড়ঙ্গ-পথে বাইরে থেকে বাতাস ঠাণ্ডা করে চালিত করতে হবে যাতে যাত্রীদের শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনো অসুবিধা না থাকে।

লণ্ডন ও প্যারিসে বিনা টিকিটে ভ্রমণ বিরল। লণ্ডনে বিভিন্ন স্টেশনের নির্দিষ্ট সব মেশিনে নির্দেশ অনুযায়ী পয়সা গলিয়ে দিলে টিকিট বেরিয়ে আসে। প্যারিসের অবস্থা ভাল, সেখানে ১৯৮০ সালে ১০টা টিকিট ১৫ ফ্রাঁতে কেনা যেত। পাতাল-রেলের যে-কোনো স্টেশন থেকে অন্য যে-কোনো স্টেশনে যেতে একটাই মাত্র টিকিট লাগে অর্থাৎ, ভাড়া সব দূরত্বেরই এক। তবে শুধু একটা টিকিট কিনলে ২½ ফ্রাঁ লাগে (১ ফ্রাঁ=২ টাকা)। স্টেশন থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে এলেই টিকিটটা অকেজো হয়ে যায়। পাতাল-রেলে যাওয়ার পথে মেশিন বসান আছে—সেটায় টিকিট ঢোকালে তাতে দাগ পড়ে এবং দরজা আপনা থেকে খুলে যায়। বেরোবার সময় লণ্ডনে টিকিট কালেক্টর টিকিট নিয়ে নেয়। প্যারিসে তার প্রয়োজন নেই—কারণ সেখানে যে-টিকিটে ঢোকার সময়ে একবার মেশিনের দাগ পড়ে সেটা পুনরায় ঢোকালে আর গলবে না। ফলে সেই টিকিট আপনা থেকেই অকেজো হয়ে যাচ্ছে। সাধারণত এখানে পাতাল-রেলের ভাড়া বাসভাড়ার চাইতে কিছু বেশি।

কলকাতায় পাতাল-রেল যাদের কারিগরি সহযোগিতায় স্থাপিত হতে চলেছে, সেই রুশীদের প্রধান শহর মস্কোর পাতাল-রেলপথের কাজ প্রথম চালু হয় ১৯৩২ সালে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত নতুন নতুন লাইন বসানো সমানে চলে আসছে। বর্তমানে মস্কো মেট্রোর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২০০ কিলোমিটার। স্টেশনের সংখ্যা ১১৫টি। প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ লোক যাতায়াত করে। ১৯৮০ সালে মাত্র ৫ কোপেকে (১ কোপেক=১২ পয়সা) যে-কোনো দূরত্বে যাওয়া যেত। এমন কী ওই অর্থের বিনিময়ে সারাদিন পাতাল-রেলে ঘোরাঘুরি চলতে পারে। শ্বেতপাথর, গ্রানাইট, ইস্পাত এবং টাইলসের অলঙ্করণে স্টেশনগুলি অত্যন্ত নয়নশোভন। আরও আছে অনুরূপ আলোকসজ্জা, ভাস্কর্য, মোজাইক এবং রঙিন কাঁচের সাজ।

মস্কো মেট্রো রুশীদের প্রচণ্ড গর্বের বস্তু।

কলকাতার পাতাল-রেলও আমাদের গর্বের বিষয় হতে পারে যদি আমরা এর নির্মাণ এবং সুরক্ষার দিকে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারি। এই ভিড়ের শহর কলকাতায় পাতাল-রেল যে কতখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, বর্তমানে সুদীর্ঘ ট্রাফিক জ্যামের দিকে নজর করলেই তা অনায়াসে বোঝা যায়।